হাদিয়া
আহলুল হাদীস

মুফতী মনসূরুল হক

www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

হাদিয়া
আহলুল হাদীস

সংকলনে
মুফতী মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস
জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
সাত মসজিদ মাদরাসা
মোহাম্মাদপুর,ঢাকা

প্রথম প্রকাশ : ১৪৩৭ হিজরী

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়

মাকতাবাতুল মানসূর

সর্বস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

মাকতাবাতুল মানসূর

باسمه تعالى

কিছু কথা

হার যামানায় যেসব ফিতনা উম্মাহর মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং ব্যাপক মহামারীর রূপ ধারণ করেছে। তন্মধ্যে অন্যতম হল, 'লা মাযহাবী ফিতনা'। এ ফিতনা মোকাবেলায় ও এদের মুখোশ উন্মোচনে যে সকল আলেমে দ্বীন উম্মাহর অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখে চলেছেন তাদের অন্যতম হলেন ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব রহ.। তিনি বিষয়টির ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরে এ ব্যাপারে বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামকে সতর্ক ও সচেতন করার জন্য বিভিন্ন এলাকায় বড় বড় ফিক্বহী সেমিনার ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম জাযা দান করেন। এ ব্যাপারে মাঠে-ময়দানে কাজ নেয়ার জন্য তিনি তার দূরদর্শিতা দ্বারা কয়েকজন আলেমকে বাছুনী করেন এবং তাদেরকে এ ময়দানে লাগান। ঐসব আলেমদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী, হারদুঈ হযরতের অন্যতম খলীফা হযরতুল আল্লাম মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা.।

ফকীহুল মিল্লাত রহ. এর নিবেদনে তিনি এখন বয়ান-বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে এদের মুখোশ উন্মোচনে বদ্ধপরিকর। মুফতী সাহেবের এসব বয়ানের মধ্যে ফকীহুল মিল্লাত রহ. এর রূহানী ফয়েয ও তাওয়াজ্জুহ স্পষ্ট। এ পর্যন্ত এ বিষয়ে হযরতের তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। আর হযরতের অসংখ্য বয়ান তো হযরতের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। হযরতের এ অসংখ্য বয়ান থেকে লা-মাযহাবী ফিতনা সংক্রান্ত চারটি বয়ান কয়েকটি ইসলামী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হলে ব্যাপক পাঠক প্রিয়তা পায় এবং জনসাধারণের মাঝে অকল্পনীয় ফায়দা পৌঁছায়। ফলে তখন থেকে বিভিন্ন মহল হতে বারবার তাকাযা আসছিল, অনুরোধ-আবেদন চলছিল বয়ান চারটি মলাটবদ্ধ করে পাঠকের সামনে পেশ করার, যাতে এর ফায়দা ব্যাপক ও স্থায়ী হয়।

একটু বিলম্বে হলেও হযরতের নির্দেশে এ খিদমত আঞ্জাম দেয়ার সৌভাগ্য হয়। আলহামদুলিল্লাহ, বয়ানগুলো প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে তা পাঠক সমীপে পেশ করা হল। এ সংকলনের কাজে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সকলকে জাযায়ে খাইর নসীব করুন। সবাইকে তাফাক্কুহ ফিদ-দীন ও রুসুখ ফিল-ইলম দান করুন।

গ্রন্থটিকে সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও কোন ধরনের অসঙ্গতি কারো নযরে পড়লে আমাদেরকে অবগত করলে কৃতজ্ঞ হব।

বিনীত
মুফতী মনসূরুল হক

সূচীপরিচিতি		পৃষ্টা
বয়ান-১ ১৬ই জানুয়ারী ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে দেশবরেণ্য উলামায়ে কিরামের উপস্থিতিতে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ বয়ান।		
	নামধারী আহলে হাদীস ফিরকার উত্থান পর্ব	৯
	আহলে হাদীস নাম ইংরেজ সরকারের অবদান	১০
	আহলে হাদীসদের হঠকারিতা	১১
	আহলে হাদীস ও নাসিরুদ্দীন আলবানী	১২
	হাদীস, আহলুল হাদীস ও সুন্নাহ-পর্যালোচনা	১৪
	সুন্নাহ অনুসরণের পক্ষে দলীল	১৭
	তাকলীদ ও আহলে হাদীসের স্ববিরোধিতা	১৯
	ভুঁইফোড় সম্প্রদায়	২০
	লা-মাযহাবীর আড়ালে তারা বড়ো তাকলীদকারী	২১
	ইজমা-ক্বিয়াস ও তাদের অবস্থান	২৩
	ফিক্বহী মাসআলার ক্ষেত্রে শিশুসুলভ আচরণ	২৪
	নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ নিয়ে তাদের অযৌক্তিক আচরণ	২৫
বয়ান-২ ২৮ মার্চ ২০১৫ খ্রি. রোজ শনিবার, লালবাগ চৌরাস্তার পার্শ্বে আইম্মায়ে মাসাজিদ, উলামায়ে কিরাম ও স্থানীয় জনগণের যৌথ-উদ্যোগে এক বিরাট দ্বীনী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলে বর্তমান লা-মাযহাবীদের সৃষ্ট বিভ্রান্তিসমূহের দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান।		
	সূচনা	২৮
	বাতিল প্রতিরোধে উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব	২৯
	শরী‘আতের দলীল ও আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের অবস্থা	৩২
	আহলে হাদীস বনাম আহলুস সুন্নাহ	৩৬
	ইলমের মারকায ও দারুল উলূম দেওবন্দ	৪৬
	চার ইমাম ও মুহাদ্দিসের সময়কাল এবং ফক্বীহ ও মুহাদ্দিসের পরিচয়	৪৯
	আহলে হাদীসের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন	৫২
	মাযহাব একাধিক হওয়ার কারণ	৫৩
	মাযহাব চার সংখ্যায় সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ	৫৭
	চার মাযহাবই হক্ব, আমরা কোনটা মানবো?	৫৭
বয়ান-৩ মার্চ ২০১৪ খ্রি.। মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত ‘লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে কেরামের করণীয়’ শীর্ষক পাঁচদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত মূল্যবান বয়ান।		

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

	ভূমিকা	৬৪
	ফিতনার পূর্বাভাস	৬৬
	চুরি কাকে বলে?	৭০
	আমাদের করণীয়	৭১
	তাকলীদ ও এর হাকীকত	৮০
	ফিক্বহ ও ফক্বীহ	৮৬
	ওয়ারিস এর হাকীকত	৮৮
	ফক্বীহ-এর গুরুত্ব ও আহলে হাদীসদের ভ্রষ্টতা	৮৯
	হাদীস ও সুন্নাহ-বিভ্রান্ত আহলে হাদীস সম্প্রদায়	৯৩
	শেষকথা	৯৭

বয়ান-৪

২৯ অক্টোবর ২০১৫ খ্রি. রোজ বৃহস্পতিবার, লা-মাযহাবীদের সৃষ্ট ফিতনার বিরুদ্ধে কক্সবাজার জেলা ইমাম পরিষদ-এর উদ্যোগে কক্সবাজার লালদিঘীর পাড় ময়দানে (হোটেল পালংকি-সংলগ্ন মাঠ) এক গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এ সমাবেশে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ছিলেন ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী ‘আব্দুর রহমান সাহেব রহ.। সমাবেশে যোগদানের একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বার্ধক্যজনিত শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতির এক পর্যায়ে হযরত অচেতন হয়ে পড়েন। মাঝে সামান্য সময়ের জন্য চেতনা ফিরে পেলে নিজের পরিবর্তে স্নেহভাজন মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. (মুহিউস্সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া-এর প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস) কে উক্ত সমাবেশে বয়ানের নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত ফক্বীহুল মিল্লাতের অন্তিম মুহূর্তের নির্দেশ পালনার্থে হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. উল্লিখিত সমাবেশে আহলে হাদীসের ফিতনার বিরুদ্ধে দীর্ঘ দেড় ঘণ্টাব্যাপী নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ বয়ানটি পেশ করেন।

	পূর্বকথা	১০০
	মাযহাবীদের ঐক্য বনাম লা-মাযহাবীদের ফিতনা	১০১
	ইজমা-ক্বিয়াসের পরিচয় ও আহলে হাদীসের অবস্থান	১০৭
	ফক্বীহ বা ইমাম বিষয়ে আহলে হাদীসদের অবস্থান	১০৭
	ইমাম মানা জরুরী	১১০
	সাহাবীদের অনুসরণ বিষয়ে আহলে হাদীসের অবস্থান	১১৩
	আহলে হাদীসদের সত্যিকার পরিচয়	১১৫
	মাযহাব মানা ছাড়া হাদীস মানা যায় না	১২৪

باسمه تعالى

বয়ান-১

১৬ই জানুয়ারী ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে দেশবরেণ্য উলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. এক গুরত্বপূর্ণ বয়ান। সকল হকপছন্দ ও সত্যানুসন্ধানীর হাতে পৌঁছে দেয়ার লক্ষেই এই প্রয়াস।

হামদ ও সালাতের পর। সন্মানিত উপস্থিতি।

নামধারী আহলে হাদীস ফিরকার উত্থান পর্ব

ইংরেজরা ভারতবর্ষ দখল করার পর যখন বুঝতে পারল জেল-যুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন এবং খুন-গুম করে এদেশের মুসলমানদেরকে দমন করা সম্ভব নয়। সত্যিকার মুসলিম জনতা চির স্বাধীন, অন্যায় ও অসত্যের কাছে তারা কখনো মাথা নত করে না, তখন তারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, বাগে আনতে হলে মুসলমানদেরকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করে দিতে হবে। ইংরেজ সরকার তাদের এ স্কিম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাদের অনুগত চারজন লোকের মাধ্যমে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে চার ধরনের ফিৎনা ছড়িয়ে দিল। এগুলোর অন্যতম ছিল, আহলে হাদীস ফিৎনা। মৌলভী আব্দুল হক বেনারসীর (মৃত্যু:১২৭৫ হি.) উদ্ভাবিত মৃতপ্রায় এই মতবাদকে পুনঃজীবিত করার লক্ষ্যে ইংরেজ সরকার মুহাম্মাদ হুসাইন আহমদ বাটালবীকে বেছে নেয়। বাটালবী সাহেব সরলমনা মুসলমানদের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে হাদীস মানার চটকদার বুলি আওড়ে এক ভয়াবহ বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেন। আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের অনুসারী মাযহাব মেনে চলা মুসলমানদেরকে তিনি কাফের-মুশরিক বলে ফতোয়া দেন। **'ইংরেজ শাসন আল্লাহর রহমত, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হারাম'**- এ ধরনের মারাত্মক বিষও তার কলম উগরে দেয়।

আহলে হাদীস নাম ইংরেজ সরকারের অবদান

শুরুর দিকে এ দলটি নিজেদেরকে মুহাম্মাদী, সালাফী, লা-মাযহাবী, ওয়াহাবী, আছারী ইত্যাদি বলে পরিচয় দিত। কিন্তু এসব পরিচয়ে তারা তেমন সুবিধা করতে পারছিল না। তাই বাটালবী সাহেব ইংরেজ সরকার বরাবর দরখাস্ত করলেন "আমার সম্পাদিত এশায়াতুস সুন্নাহ পত্রিকায় ১৮৮৬ইং সনে প্রকাশ করেছিলাম যে, ওয়াহাবী শব্দটি ইংরেজ সরকারের নিমকহারাম ও রাষ্ট্রদ্রোহীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এ শব্দটি হিন্দুস্তানের মুসলমানদের ঐ অংশের জন্য ব্যবহার করা সমীচীন হবে না যাদেরকে আহলে হাদীস বলা হয় এবং যারা সর্বদা ইংরেজ সরকারের নিমকহালালী, আনুগত্য ও কল্যাণই কামনা করে যা বারবার প্রমাণিতও হয়েছে এবং সরকারী চিঠি-পত্রেও এর স্বীকৃতি আছে। অতএব

এ দলের প্রতি ওয়াহাবী শব্দ ব্যবহারের জোর প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে এবং গভর্নমেন্ট বরাবর অত্যন্ত আদব ও সবিনয় নিবেদন করা যাচ্ছে যে, সরকারীভাবে এই ওয়াহাবী শব্দ রহিত করে আমাদের উপর তা প্রয়োগের নিষেধাজ্ঞা জারী করা হোক। -আপনার অনুগত আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ হুসাইন, সম্পাদক এশায়াতুস সুন্নাহ”।

অনুগত বান্দার এ আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নর দফতর থেকে **“তার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হল এবং তাদের জন্য আহলে হাদীস নাম সরকারীভাবে বরাদ্দ করা গেল”**-মর্মে চিঠি পাঠানো হয়। সরকারের তরফ থেকে পাঠানো সেসব চিঠির তালিকা লক্ষ্য করুন- পাঞ্জাব গভর্নর সেক্রেটারি মি. ডব্লিউ এম এন- চিঠি নং ১৭৫৮, সি পি গভর্নমেন্ট- চিঠি নং ৪০৭, ইউ পি গভর্নমেন্ট- চিঠি নং ৩৮৬, বোম্বাই গভর্নমেন্ট- চিঠি নং ৭৩২, মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট- চিঠি নং ১২৭, বাঙ্গাল গভর্নমেন্ট- চিঠি নং ১৫৫ (সূত্র: এশায়াতুস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ৩২-৩৯, সংখ্যা ২, খণ্ড ১১)।

আহলে হাদীস খেতাব বরাদ্দ পেয়ে বাটালবী সাহেব দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে হাদীস মানার নামে মুসলমানদেরকে গোমরাহ করেন। এ কাজে তিনি নিজের সবটুকু শ্রম-সাধনা ইংরেজের সন্তুষ্টি অর্জনে বিলিয়ে দেন। তারপর কুদরতের কারিশমা দেখুন, পঁচিশ বছর পর সেই এশায়াতুস সুন্নাহ পত্রিকায় সেই মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী লিখলেন **‘যে ব্যক্তি ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যেতে চায় তার জন্য সহজ পথ হল, তাকলীদ (মাযহাবের ইমামের অনুসরণ) ছেড়ে দেয়া।’** (সূত্র: এশায়াতুস সুন্নাহ, খণ্ড ১১, সংখ্যা ২, পৃষ্ঠা ৫৩)। এ যেন নিজের হাঁড়ি নিজেই হাটে ভাঙ্গার নামান্তর।

বাটালবী সাহেব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ইংরেজের সেবা করে গেছেন। ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করে। তিনি মরে গেছেন কিন্তু তার বই-পুস্তক আর ভ্রান্ত মতবাদ আজও রয়ে গেছে। সেগুলোর মাধ্যমে এখনো হাজার হাজার মুসলমান গোমরাহ হচ্ছে।

আহলে হাদীসদের হঠকারিতা

আমাদের পূর্বসূরী দেওবন্দী আকাবিরদের প্রতিরোধের মুখে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত আহলে হাদীস ফিৎনার দরজা বন্ধ ছিল। কিন্তু আমাদের অলসতার সুযোগে তারা আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এতদিন তারা গর্তে লুকিয়ে ছিল, এখন বের হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। মাযহাব মানার স্বরূপ না বুঝে কিংবা জেনে বুঝেই হঠকারিতা বশতঃ তারা বলে, আমরা নাকি ইমাম আবূ হানীফা রহ.কে নবী মেনে কাফির হয়ে গেছি। আশ্চর্য! আমরা কিভাবে আবূ হানীফাকে নবী মানলাম? নবীর তো প্রতিটি আদেশ-নিষেধই উম্মতকে মেনে চলতে হয়। অথচ আমরা তো বহু মাসআলায় আবূ হানীফা রহ. এর তাকলীদই

করি না। কারণ সেগুলো এতটাই স্পষ্ট যে, কোনরূপ ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। অনুরূপ হাজারও মাসআলায় হানাফী মুফতীগণ সাহেবাইনের মতানুযায়ী ফাতাওয়া দিয়ে থাকেন। তাহলে কিভাবে আমরা ইমাম আবূ হানীফাকে নবী মানলাম? তাছাড়া সব বিষয়েই কি ইমামের তাকলীদ করা হয়? তাকলীদ তো করা হয় এমন কিছু জটিল বিষয়ে যার সমাধান কুরআন-হাদীসে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। অনুরূপ একই বিষয় যখন বাহ্যতঃ সাংঘর্ষিক একাধিক বিধান পাওয়া যায় তখন কোনটা নাসেখ আর কোনটা মানসূখ তা আমরা জানি না বা বুঝতে পারি না। তাই এ জাতীয় ক্ষেত্রে আমরা খাইরুল কুরূনের মুজতাহিদ ইমামদের বুঝ ও উপলব্ধিকে আমাদের বুঝ ও উপলব্ধির চেয়ে শতগুণ উত্তম মনে করে তাদের বুঝ-উপলব্ধির অনুসরণ করি। আমরা কখনই তাদের ব্যক্তি সত্তার পূজা করি না। এটাই তাকলীদের মূল কথা। কিন্তু যেসব বিষয় কুরআন-সুন্নাহয় স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ রয়েছে যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া, রমাযান মাসে রোযা রাখা, যাকাত দেয়া, হজ্ব করা এ জাতীয় শত শত বিষয়ে আমরা কোন ইমামের ব্যাখ্যার অপেক্ষা করি না। অর্থাৎ তাদের তাকলীদের প্রয়োজন অনুভব করি না। কারণ এসব বিষয় কুরআন-সুন্নাহ থেকে আমরাই স্পষ্ট বুঝতে পারছি। তাহলে বলুন, এভাবে তাকলীদ করার কারণে আমরা কিভাবে কাফির-মুশরিক হয়ে গেলাম?

আহলে হাদীস ও নাসিরুদ্দীন আলবানী

হার যামানায় আহলে হাদীস নামক এই ভ্রান্ত মতবাদকে নতুন করে চাঙ্গা করেছেন মরহুম নাসিরুদ্দীন আলবানী। তার বাড়ী সিরিয়ার আলবেনিয়া নামক স্থানে। **তার পিতা নূহ নাজাতী রহ. হানাফী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলেম ছিলেন। ছেলের বিতর্কিত আচরণে অধৈর্য হয়ে ছেলেকে তিনি ত্যাজ্য ঘোষণা করেন।** সিরিয়ার জনগণ মরহুম আলবানীকে বিতর্কিত মতবাদের কারণে সিরিয়া থেকে বহিষ্কার করে দেয়। তারপর তিনি সৌদিআরবে আশ্রয় নেন। এক পর্যায়ে সৌদির আলেম উলামা ও জনসাধারণও তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ফলে সরকারী নির্দেশে ১৯৯১ সালে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তিনি আরবভূমি ছাড়তে বাধ্য হন। সেখান থেকে পালিয়ে তিনি জর্ডানে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই ১৯৯৯ইং সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার কোন নিয়মতান্ত্রিক উস্তাদ ছিল না। ব্যক্তিগত গবেষণা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে যা বুঝেছেন তাই লিখে গেছেন। এ ব্যাপারে তার বিশেষ অবদান(?) হল, তিনি হাদীসসমূহকে সহীহ, যঈফ দুই ভাগে বিভক্ত করে দু'টি কিতাব সংকলন করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, তিনি যঈফ হাদীসের সংকলনের সাথে মউযূ' হাদীসকে মিলিয়ে উভয়টিকে একাকার করে ফেলেছেন এবং যঈফ, মউযূ'র সমন্বিত সংকলনের নাম দিয়েছেন

سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السئ فى الامة

এখন প্রশ্ন হল, যঈফ আর মউযূ' কি এক জিনিস, উভয়টির ক্ষেত্রে কি একই বিধান প্রযোজ্য হয়? মউযূ' তো হাদীসই নয়; এটাতো রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা ও বানোয়াট প্রচারণা। অথচ যঈফ তো হাদীস। ضعف (যু'ফ) হল, সনদের সিফাত; হাদীসের সিফাত নয়। যেমন, সহীহ, হাসান এগুলো সনদের সিফাত; হাদীসের সিফাত নয়। এগুলো দ্বারা তো সনদের অবস্থা বুঝানো হয়। যঈফ হাদীস যদি একাধিক সনদে আসে তখন এর দ্বারা হুকুমও সাবেত হয়। অনুরূপ যঈফ হাদীস যদি উম্মত কবুল করে নেয় তাহলে তা সহীহ'র মতো হয়ে যায়। যেমন, لا وصية لوارث এই হাদীসের সনদ তো যঈফ কিন্তু উম্মত এটাকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে বলে তা মা'মূলবিহী হয়েছে এবং এর দ্বারা হুকুমও সাবেত হয়েছে। অনুরূপ طلب العلم فريضة على كل مسلم এই হাদীসটি পঞ্চাশটি সনদে এসেছে। (ইবনে মাজাহ, ২২৪ নং হাদীসের টীকা)। কিন্তু প্রত্যেকটি সনদই যঈফ। তথাপি এতগুলো সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী হয়ে গেছে। ফলে এর দ্বারা ফরযের মতো গুরুত্বপূর্ণ হুকুম সাবেত করা হয়েছে। আর যঈফ হাদীস যদি হাসান লিগাইরিহী পর্যন্ত না-ও পৌঁছে তবুও তা মউযূ'র মতো বেকার নয়। বরং কিছু শর্ত সাপেক্ষে ফযীলতের ক্ষেত্রে তা আমলযোগ্য। তাহলে বলুন, হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে যার ন্যূনতম জ্ঞানও রয়েছে তার পক্ষে যঈফ আর মউযূ'কে এক মনে করা কিভাবে সঠিক হতে পারে? বর্তমানে আরব বিশ্বে আলবানী সাহেবের বিরুদ্ধে বহু কিতাব লেখা হচ্ছে। তার মধ্যে *তানাকুযাতে আলবানী* নামক কিতাবটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। লেখক এই কিতাবে আলবানী সাহেবের স্ববিরোধী কথা ও কাজগুলো দায়িত্বের সাথে তুলে ধরেছেন। তিনি সেখানে দেখিয়েছেন, **আলবানী সাহেব কোনো একটি হাদীস তার মতের পক্ষে হওয়ায় সেটাকে সহীহ বলেছেন। আবার ঐ একই সনদে বর্ণিত হাদীস দ্বারা যখন তার বিরোধী পক্ষ দলীল দিয়েছেন তখন সেটাকে নির্দ্বিধায় যঈফ বলে দিয়েছেন। এ জাতীয় বহু ঘটনা ঐ কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে।**

হাদীস, আহলে হাদীস ও সুন্নাহ-পর্যালোচনা

'আহলুল হাদীস' মূলতঃ হাদীস বিশারদ ও শাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ ইমামদের উপাধি। ১২৪৬ হিজরীর পূর্বে ফেরকা ও সম্প্রদায়ের আদলে পৃথিবীতে আহলে হাদীস নামে কোন দলের অস্তিত্ব ছিল না। বর্তমানের আহলে হাদীস ফেরকা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে এ কথার দাবী করে যে, তারা সর্ব ক্ষেত্রে হাদীস মেনে চলে। অথচ হাদীসের কিতাবে দেখা যায়, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে কোথাও হাদীস মানতে বলেননি; বরং তিনি যেখানেই তাঁকে মানতে ও অনুসরণ করতে বলেছেন সেখানে সুন্নাহ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি উম্মতকে সুন্নাহ অনুসরণ করতে বলেছেন, সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে বলেছেন; হাদীস অনুসরণ করতে কিংবা আঁকড়ে ধরতে বলেননি। বরং তিনি গোমরাহ ফেরকার কার্যক্রম বুঝাতে গিয়ে হাদীস শব্দ ব্যবহার করেছেন। সহীহ মুসলিমের সাত নং হাদীস এ

কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তিনি বলেন, **শেষ যামানায় অনেক প্রতারক ও মিথ্যুক লোকের আবির্ভাব হবে। তারা তোমাদের কাছে এমন হাদীস পেশ করবে যা তোমরাও শোননি, তোমাদের পূর্বপুরুষগণও শোনেনি। সাবধান! তারা যেন তোমাদেরকে গোমরাহ করতে না পারে।**

বস্তুতঃ হাদীস ও সুন্নাহ এক জিনিস নয়, এ দু'য়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আমাদের আকাবিরগণ তাদের বিভিন্ন কিতাবে হাদীস ও সুন্নাহর পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। যার সারকথা হল, উম্মতের জন্য দ্বীনের উপর চলার অনুসরণীয় পথকে সুন্নাহ বলে। আর **প্রত্যেক সুন্নাহই হাদীস কিন্তু সকল হাদীস সুন্নাহ নয়।** অর্থাৎ সকল হাদীসই উম্মতের জন্য দ্বীনের উপর চলার অনুসরণীয় পথ নয়। কেননা হাদীসের মধ্যে বহু হাদীস এমন আছে যেগুলোর বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে। যেমনঃ

- বুখারী শরীফের কিতাবুল জানায়েযের ১৩০৭ থেকে ১৩১৩ নং হাদীসসমূহ। এসব হাদীসে জানাযা বহন করে নিয়ে যেতে দেখলে সকলকে দাঁড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে। অথচ এই বিধান অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। (উমদাতুল ক্বারী ৬/১৪৬)

- ইসলামের প্রথম যুগে নামাযরত অবস্থায় কথা বলা, সালাম দেয়া, সালামের উত্তর দেয়া সবই বৈধ ছিল। কিন্তু পরবর্তিতে এই বিধান রহিত হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী হা. নং ১১৯৯, ১২০০)

- ইসলামের প্রথম যুগে বিধান ছিল যে, আগুনে রান্নাকৃত খাদ্য গ্রহণ দকরলে উযু ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু পরবর্তিতে এই বিধান রহিত হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী হা. নং ২০৮)

- নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পর মদীনায় ১৬/১৭ মাস বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন। কিন্তু পরবর্তিতে এই বিধান রহিত হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী হা. নং ৭২৫২)

উপরিউক্ত সবই সহীহ হাদীস কিন্তু সুন্নাহ নয়। অর্থাৎ এ হাদীসগুলো উম্মতের জন্য অনুসরণীয় নয়।

এমন অনেক হাদীস আছে যার বিধান নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নির্দিষ্ট। উম্মতের জন্য তার উপর আমল করা বৈধ নয়। যেমন-

- বহু হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এগারটি বিবাহের কথা এবং মহর দেওয়া ছাড়া বিবাহ করার কথা এসেছে। তো এগুলো হাদীস বটে কিন্তু উম্মতের জন্য অনুসরণীয় নয়। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ ১১/১৪৩-২১৭)

- হাদীসে এমন অনেক আমলের কথা বর্ণিত আছে যা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোন বিশেষ প্রয়োজনে করেছেন। যেমন, কোমরে ব্যথা থাকার কারণে কিংবা এস্তেঞ্জা করার স্থানে বসার দ্বারা শরীরে বা কাপড়ে নাপাকী লাগার আশঙ্কায় তিনি সারা জীবনে মাত্র দুই বার দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। কিন্তু হাদীসের বর্ণনায় এসব কারণের কথা উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র দাঁড়িয়ে পেশাব করার কথা আলোচিত হয়েছে। তো এই হাদীসের উপর আমল করে কি দাঁড়িয়ে পেশাব করাকে সুন্নাত বলা যাবে? অনুরূপভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় এবং রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। (সহীহ বুখারী হা. নং ১৯৩৮)। তাই বলে কি ইহরাম ও রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগানোকে সুন্নাত বলা যাবে?
- কাজটি বৈধ একথা বুঝানোর জন্যও নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক কাজ করেছেন। যেমন, তিনি একবার তাঁর নাতনী উমামা বিনতে যয়নবকে কোলে নিয়ে নামায পড়িয়েছেন। (সহীহ বুখারী হা. নং ৫১৬)। আরেকবার রোযা অবস্থায় তাঁর এক স্ত্রীকে চুম্বন করেছেন। (সহীহ বুখারী হা. নং ১৯২৮)। এই উভয় ঘটনাই হাদীসে এসেছে। এর দ্বারা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝাতে চেয়েছেন যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শিশু কোলে নিয়ে নামায পড়া বা পড়ানো যেতে পারে এবং রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা বৈধ, এতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। তাই বলে কি সব সময় শিশু কোলে নিয়ে নামায পড়ানোকে কিংবা রোযা অবস্থায় স্ত্রী চুম্বনকে সুন্নাত বলা যাবে?

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হল, আহলে হাদীস নামটিই সঠিক নয়। কারণ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বর্ণনায় উম্মতকে হাদীস মানতে বলেননি, বলেছেন সুন্নাত মানতে। তারপরও যারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে দাবী করে তাদের উচিৎ এগারটি বিবাহ করা, মহর ছাড়া বিবাহ করা, ইহরাম ও রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো, রোযা অবস্থায় স্ত্রী চুম্বন করা, দাঁড়িয়ে পেশাব করা ইত্যাদিকে সুন্নাত মনে করে আমল করা। অনুরূপ জীবনে মাত্র তিন দিন মসজিদে এসে তারাবীহ পড়া, নামাযরত অবস্থায় কথা বলা, সালাম দেয়া, সালামের উত্তর দেয়া। কারণ এগুলোও তো হাদীসে এসেছে। কিন্তু তারা তো এসব করে না। তাহলে হাদীস মানার দাবীদার হয়ে এসব হাদীসের উপর আমল না করে কিভাবে তারা আহলে হাদীস হল? আসল কথা হল, **তারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বললেও বাস্তবে তা বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নয়।** অপরদিকে যেহেতু নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে বলেছেন তাই **আমরা মাযহাব অনুসারীগণ হাদীসের শুধুমাত্র সুন্নাহ অংশের অনুসরণ করি এবং নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ বলে পরিচয়**

দিই। অর্থাৎ আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মানি এবং সাহাবায়ে কেরামের জামা‘আতকে অনুসরণ করি।

সুন্নাহ অনুসরণ পক্ষে দলীল

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে ও মানতে বলেছেন। এ সম্পর্কীয় কয়েকটি হাদীস লক্ষ্য করুন,

১. المتمسك بسنتي عند فساد امتي له اجر شهيد. المعجم الأوسط لأبى القاسم الطبراني (৫/৩১৫)

২. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. الموطأ بروايتين(৫/৮৯৯)

৩. من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدى فإن له من الأجر مثل من عمل بها. سنن الترمذى لمحمد الترمذى(৫/8৫)

8. من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. سنن الترمذى لمحمد الترمذى(৫/8৬)

৫. من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. سنن الترمذى لمحمد الترمذى(8/৬৬৯)

৬. ستة لعنتهم ولعنهم الله ...... والتارك لسنتي. سنن الترمذى لمحمد الترمذى (8/8৫৭)

৭. تمسك بسنة خير من إحداث بدعة. مسند أحمد بن حنبل(8/১০৫)

৮. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته. صحيح مسلم(১/৬৯)

৯. عليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سنن أبي داود(8/৩১৬)

১০. فعليكم بما عرفتم من سنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. سنن ابن ماجة للقزويني(১/১৫)

এখানে মাত্র দশটি হাদীস উল্লেখ করা হল। এসব হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে বলেছেন, সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতে বলেছেন এবং সুন্নাহ তরককারীর উপর লা’নত করেছেন। একটি বর্ণনায়ও তিনি শুধু হাদীসকে (যা সুন্নাহর পর্যায়ে পৌঁছেনি) আঁকড়ে ধরতে বলেননি। আহলে হাদীস ভাইয়েরা গ্রহণযোগ্য এমন একটি হাদীসও পেশ করতে

পারবেন কি যার মধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে হাদীস আঁকড়ে ধরতে বলেছেন কিংবা হাদীস অনুযায়ী উম্মতকে চলতে বলেছেন? হ্যাঁ, তিনি হাদীস রেওয়ায়েত করতে বলেছেন, অন্যের কাছে পৌঁছাতে বলেছেন। কিন্তু হাদীস আঁকড়ে ধরতে বলেননি বা হাদীস অনুযায়ী আমল করতে বলেননি। আমল করার জন্য তো হাদীসকে সুন্নাহ পর্যায়ে পৌঁছতে হয়।

তাকলীদ ও আহলে হাদীসদের স্ববিরোধিতা

আহলে হাদীস ফেরকা তাকলীদকে শিরক বলে। অথচ তারা তাদের দাবী প্রমাণে বুখারী মুসলিম এ ধরনের যেসব হাদীসের কিতাব থেকে দলীল দেয় সেসব কিতাবের কোথাও তাকলীদকে শিরক বলা হয়নি; বরং এগুলোর লেখক সবাই কোন না কোন মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করতেন। যেমন, ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। (তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ, ১/৪২৫-৪২৬)। ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম নাসায়ী হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। (মা‘আরিফুস সুনান, ১/৮২-৮৩)। প্রশ্ন হল, তাকলীদ করার কারণে কেউ যদি মুশরিক হয়ে যায় তাহলে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী কুতুবে সিত্তার ছয় জন লেখকই মুশরিক সাব্যস্ত হবেন (নাউযুবিল্লাহ)। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁদের কিতাব দিয়ে দলীল দেয় কেন? মুশরিকদের(?) লেখা কিতাব দিয়ে শরঈ বিষয়ে দলীল দেয়া জায়েয হবে কি?

আহলে হাদীস ভাইয়েরা হাদীসের ক্ষেত্রে সহীহ, যঈফ ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন। এগুলোও তারা তাকলীদকারীদের কিতাব থেকেই শিখেছেন। কারণ উসূলে হাদীসের পুরনো সব কিতাব তাকলীদকারী আলেমগণেরই লেখা। এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা লক্ষ্য করুন,

১.নুখবাতুল ফিকার (ইবনে হাজার আসকালানী শাফেয়ী)

২.মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ (ইবনুস সালাহ শাফেয়ী)

৩.মুকাদ্দামাতুশ শাইখ (আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী হানাফী)

৪.আত্ তাসবিয়াতু বাইনা হাদ্দাসানা ওয়া আখবারানা (ইমাম ত্বহাবী হানাফী)

৫.তাওজীহুন নযর (তাহের ইবনে সালাহ জাযায়েরী হানাফী)

৬.তাওযীহুল আফকার (আমীরে সান‘আনী হানাফী)

৭.শরহু শরহি নুখবাতিল ফিকার (মুল্লা আলী ক্বারী হানাফী)

৮. ক্বাফুল আসার ফী সাফিফ উলূমিল আসার (রযীউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম হানাফী)

৯. ইম্‘আনুন নযর (শাইখ আকরাম সিন্ধী হানাফী)

১০. আর রাফ্‌উ ওয়াত তাকমীল (আব্দুল হাই লাখনুবী হানাফী)

১১.আল ইলমা (কাযী ইয়ায মালেকী)

১২.আত্ তাক্বয়ীদ ওয়াল ঈযাহ (ইবনে রজব হাম্বলী)।

এভাবে উসূলে হাদীসের উপর যত কিতাব আছে সবই কোন না কোন মুকাল্লিদ ও মাযহাবের অনুসারী লিখেছেন। প্রশ্ন হল, তাদের বক্তব্য অনুযায়ী এসব মুশরিকদের(?) কিতাব থেকে নেয়া হাদীস শাস্ত্রের এ সকল পরিভাষা তাদের জন্য ব্যবহার করা কিভাবে বৈধ হবে?

কথায় বলে, 'আমার ছাও আমারেই খাও?' এতো নিকৃষ্টমানের স্ববিরোধিতা শিক্ষিত লোকেরা বুঝবেনা, তা কী করে হয়?

ভুঁইফোর সম্প্রদায়

মাযহাব অস্বীকারকারী তথাকথিত আহলে হাদীসদের কোন ধারাবাহিক সিলসিলা নেই। তাদের জন্মই হয়েছে ব্রিটিশ সরকারের গর্ভে। ব্রিটিশরা এই উপমহাদেশ দখল করার আগে তাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। থাকলে তারা ১২৪৬ হিজরীর পূর্বে আহলে হাদীস সম্প্রদায় কর্তৃক লেখা হাদীস, উসূলে হাদীস, তাফসীর, উসূলে তাফসীর, ফিক্বহ ও উসূলে ফিক্বহ সম্পর্কীয় কোন কিতাব পেশ করুক। তাদের প্রতি আমাদের চ্যালেঞ্জ, সম্ভব হলে তারা উপরোক্ত ছয় বিষয়ে তাদের লিখিত অন্ততঃ ছয়টি কিতাব দেখাক। তবে অবশ্যই সেটা ১২৪৬ হিজরীর পূর্বের লেখা হতে হবে। বস্তুতঃ তাফসীর, হাদীস ও ফিক্বহ সম্পর্কে লিখিত যেসব কিতাব পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান তার সবই কোন না কোন মাযহাবের অনুসারী কিংবা মুজতাহিদের লেখা। কি আশ্চর্য বৈপরীত্য! মাযহাব অনুসারীদের কিতাব পড়ে পড়ে গলাবাজী করবে আবার তাদেরকে কাফির-মুশরিকও বলবে!

এ প্রসঙ্গে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী, মাহমূদ হাসান গঙ্গুহী রহ. বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, হযরত মাওলানা ইবরাহীম বালিয়াবী রহ. বলেছেন, আমার একজন আহলে হাদীস উস্তাদ ছিলেন। তিনি ফাতাওয়াও লিখতেন। একদিন তার কামরায় প্রবেশ করে দেখি, তিনি ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ কিতাব হিদায়া ও ফাতাওয়ায়ে আলমগীরিয়া অধ্যয়ন করছেন। আমি বিস্মিত হয়ে তাকে বললাম, জনাব! আপনি আহলে হাদীস হয়েও হানাফীদের কিতাব অধ্যয়ন করছেন? তিনি বললেন, এসব কিতাব ছাড়া জুযইয়্যাত (শাখাগত বিভিন্ন মাসআলার সমাধান) আর কোথায় পাব? ফাতাওয়া তো এসব কিতাব দেখেই দেই কিন্তু দলীলের আলোচনায় এগুলোর নাম উল্লেখ করি না। বরং হিদায়ার মাসআলার দলীল হিসেবে হিদায়ার মতন ও টীকায় যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো উল্লেখ করে লিখে দেই এই মাসআলাটি উক্ত হাদীস থেকে সাবেত হয়েছে। (মালফূযাতে ফকীহুল মিল্লাত, ২/৯১)। বুঝুন অবস্থা! মুকাল্লিদদের কিতাব ছাড়া একটি কদমও চলে না আবার গলাবাজীর ধারও কমে না। একেই বলে 'নেই চাল-চুলো, খাই কলা-মূলো'।

লা-মাযহাবীর আড়ালে তারাই বড় তাকলীদকারী

আহলে হাদীস সম্প্রদায় যদিও প্রচার করে যে, তারা কারো তাকলীদ করে না। কিন্তু বাস্তবে তারা মুহাদ্দিসীনে কেরামের তাকলীদ করে থাকে। কারণ তারা কোন বিষয়ের দলীল হিসেবে বুখারী, মুসলিম ও হাদীসের অন্যান্য কিতাব থেকে দলীল পেশ করে থাকে। এর অর্থ হল, তারা এসব মুহাদ্দিসীনে কেরামকে নির্দ্বিধায় অনুসরণ করে। আর এটাই তো তাকলীদ। অথচ বড় বড় মুহাদ্দিসীনে কেরাম নিজেরা ফাতাওয়া না দিয়ে ফাতাওয়ার জন্য জনসাধারণকে ফকীহদের কাছে যেতে বলতেন। এ ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী রহ. এর মন্তব্যটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সুনানে তিরমিযীর কিতাবুল জানায়েযের এক হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, هكذا قال الفقهاء و هم اعلم بمعانى الحديث 'ফকীহগণ এই হাদীসের ব্যাপারে এমনটিই বলেছেন আর তারা হাদীসের মর্ম সবচেয়ে ভাল জানেন'। (তিরমিযী, হা. নং ৯৯০)

মুহাদ্দিসীনে কেরাম ফাতাওয়ার জন্য লোকদেরকে মুজতাহিদ ইমামদের দারস্থ হওয়ার পরামর্শ দিতেন এ রকম দু'টি ঘটনা লক্ষ্য করুন-

(এক) সুলাইমান ইবনে মেহরান আল আ'মাশ রহ. এর কাছে এক ব্যক্তি ফাতাওয়া জানতে আসল। তিনি তাকে ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. ছিলেন সুলাইমান ইবনে মেহরানের হাদীসের ছাত্র। আবূ ইউসুফ রহ. প্রশ্নকারীকে সন্তোষজনক জবাব প্রদান করলেন। ইমাম আ'মাশ রহ. আশ্চর্য হয়ে আবূ ইউসুফ রহ. কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই জবাব কিভাবে দিলে? তিনি বললেন, জনাব! গতকাল আপনি যে হাদীস পড়িয়েছেন তার মধ্যেই তো এই প্রশ্নের জবাব রয়েছে। বিস্মিত ইমাম আ'মাশ মন্তব্য করলেন, انتم الاطباء ونحن الصيادلة আসলে তোমরা হলে ডাক্তার আর আমরা কেবল ওষুধ বিক্রেতা। অর্থাৎ ওষুধ বিক্রেতার কাছে ওষুধের ভাণ্ডার থাকে কিন্তু কোন ওষুধ কোন রোগের জন্য তা তার জানা থাকে না। ঠিক তেমনই যে মুহাদ্দিস মুজতাহিদ নন তার কাছে হাদীস তো প্রচুর থাকে কিন্তু হাদীস দ্বারা কোন্ মাসআলা প্রমাণিত হয় তা তার জানা থাকে না। (আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী লিস্ সায়মারী, পৃষ্ঠা ১২-১৩)

(দুই) সদরুদ্দীন রহ. মানাকেবে আবী হানীফা নামক কিতাবে লিখেছেন, একবার উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন ইয়াযীদ ইবনে হারূন রহ. এর নিকট এক ব্যক্তি ফাতাওয়া জানতে আসল। তখন তার নিকট উপস্থিত ছিলেন তার বিশিষ্ট শাগরেদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আলী ইবনুল মাদীনী, যুহাইর ইবনে হারব প্রমূখ মুহাদ্দিসীনে কেরাম। তিনি ঐ ব্যক্তিকে বললেন, 'ফাতাওয়ার জন্য এখানে এসেছো কেন? আহলে ইলমদের কাছে যাও।' হযরত আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বিস্মিত হয়ে বললেন, হুযূর! আপনার নিকট উপস্থিত এই বিশাল

ব্যক্তিত্বের অধিকারীগণ কি আহলে ইলম নন?! তিনি বললেন, না, তোমরা আহলে ইলম নও, তোমরা তো হলে আহলুল হাদীস (অর্থাৎ হাদীস বিশারদ) আহলে ইলম হল, আবূ হানীফার শিষ্যগণ। (ইরশাদুল কারী, পৃষ্ঠা ৩২)

দেখা যাচ্ছে, বড় বড় মুহাদ্দিসগণ ফাতাওয়ার জন্য জনসাধারণকে মুজতাহিদ ফকীহদের দারস্থ হতে বলছেন। এখন তথাকথিত আহলে হাদীসদেরকে প্রশ্ন করা যেতে পারে, তারা যেসব মুহাদ্দিস ইমামদের তাকলীদ করে থাকেন সেই মুহাদ্দিস ইমামগণ জনসাধারণকে যেসব ফকীহদের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিতেন তারা এদেরকে মানেন না কেন? এবং এ ক্ষেত্রে তারা তাদের মুহাদ্দিস ইমামদের অনুসরণ করেন না কেন? তাদের কাছে এই প্রশ্নের কোন গ্রহণযোগ্য জবাব আছে কি? উপরন্তু মুহাদ্দিস ইমামগণ মুজতাহিদ ফকীহদেরকে মান্যবর মনে করার কারণে মুহাদ্দিসগণকেও কি তারা মুশরিক বলার হিম্মত রাখেন?

ইজমা-কিয়াস ও তাদের অবস্থান

আহলে হাদীস সম্প্রদায় ইজমা কিয়াসকে শরী‘আতের দলীল মানে না। অথচ ইজমা কিয়াস শরী‘আতের দলীল হওয়ার বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। ইজমা দলীল হওয়া সূরা নিসার ১১৫ নং আয়াত

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا .

দ্বারা প্রমাণিত। এই আয়াত দ্বারা মুফাসসির এবং উসূলবিদ উলামায়ে কেরাম ইজমাকে শরী‘আতের দলীল প্রমাণ করেছেন। আর সূরা হাশরের ২ নং আয়াত (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. الحشر:٢) দ্বারা কিয়াসকে শরী‘আতের দলীল প্রমাণ করেছেন। তাছাড়া হাদীসের কিতাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের কিয়াসের তো বহু বহু প্রমাণ রয়েছে।

আহলে হাদীস সম্প্রদায় ইজমা কিয়াসকে শরী‘আতের দলীল না মানায় তারা সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াত اليوم اكملت لكم دينكم.
‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম’ অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হয়। কেননা এমন হাজার হাজার মাসআলা আছে যার সমাধান সরাসরি কুরআন-হাদীসে পাওয়া যায় না। এসব ক্ষেত্রে ফকীহগণ ইজমা অথবা কিয়াসের মাধ্যমে সমাধান দিয়ে থাকেন। যারা ইজমা ও কিয়াসকে শরী‘আতের দলীল মানবে না তারা ঐসব মাসআলার সমাধান কিভাবে দিবে? এবং আল্লাহ তা‘আলার ঘোষণা ‘আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম’ এর বাস্তবায়ন কিভাবে সম্ভব হবে? কয়েকটি মাসআলা লক্ষ্য করুন, আমাদের জানা মতে এগুলোর সমাধান সরাসরি কুরআন-হাদীসে পাওয়া যায় না। আহলে হাদীস সম্প্রদায়কে এই মাসআলাগুলোর সমাধান কোন প্রকার কিয়াসের আশ্রয় নেয়া

ছাড়া সরাসরি কুরআনের আয়াত কিংবা সুস্পষ্ট হাদীস দ্বারা দেয়ার অনুরোধ করা হল-

- ডেসটিনি ২০০০ লি. জায়েয হবে কি না?
- প্রাইজবন্ড কেনা জায়েয হবে কি না?
- প্রভিডেন্ড ফান্ড বা জি.পি ফান্ডের টাকা ও লভ্যাংশ গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?
- বর্তমান শেয়ার বাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে কি না?
- প্লাস্টিক সার্জারি করা জায়েয হবে কি না?
- বীমা-ইন্স্যুরেন্স করা জায়েয হবে কি না?
- ট্রেড মার্ক বেচা-কেনা জায়েয হবে কি না?
- দেশি-বিদেশি কাগজের নোট পরস্পরে কম-বেশী মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে কি না?
- অ্যাডভান্সের টাকা গ্রহণ করা ও ব্যবহার করা জায়েয হবে কি না?
- শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রয় করা বা দান করা জায়েয হবে কি না?
- বিমানে নামায পড়া জায়েয হবে কি না?
- রোযা অবস্থায় ইঞ্জেকশন নেওয়া জায়েয কি না?

হাজার হাজার আধুনিক মাসাইলের মধ্য থেকে মাত্র ১২টি মাসআলা উল্লেখ করা হল। আহলে হাদীস সম্প্রদায় পারলে কোন প্রকার কিয়াসের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া অন্ততঃ এই ১২টি মাসআলার সমাধান যেন কুরআনের স্পষ্ট আয়াত বা স্পষ্ট হাদীস দ্বারা দেন। কুরআনের স্পষ্ট আয়াত বা স্পষ্ট হাদীস দ্বারা এই মাসআলাগুলোর সমাধান না দিতে পারলে তারা 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম' এই আয়াতের অস্বীকারকারী প্রমাণিত হবে।

ফিক্বহী মাসআলার ক্ষেত্রে শিশুসুলভ আচরন

তাদেরকে কোন ফিকহী মাসআলার কথা বললে তারা বলে, সহীহ/সরীহ, মুত্তাসিল/মারফূ' হাদীস দিয়ে দলীল দিলে তারা মানতে রাজি আছে অন্যথায় এসব মাসআলা-মাসাইল তারা মানবে না। তাদেরকে বলব, আপনারা সহীহ/সরীহ/মুত্তাসিল/মারফূ' হাদীস কাকে বলে অর্থাৎ হাদীসের এসব সংজ্ঞা কুরআনের আয়াত বা হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন তাহলে আমরাও প্রত্যেক মাসআলা সহীহ/সরীহ/মুত্তাসিল/মারফূ' হাদীস দ্বারা প্রমাণ করতে পারবো। সম্ভব হলে তারা কুরআন কিংবা হাদীস দ্বারা সহীহ/সরীহ/মুত্তাসিল/মারফূ' হাদীসের সংজ্ঞা প্রমাণ করে দেখাক। অন্ততঃ এতটুকুই প্রমাণ করুক যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লাম শুধু সহীহ/সরীহ/মুত্তাসিল/মারফূ’ হাদীসই মানতে বলেছেন। অন্যান্য হাদীস মানতে নিষেধ করেছেন।

নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ নিয়ে তাদের অযৌক্তিক আচরণ

কুরআন-হাদীস বোঝার ক্ষেত্রে যারা ইমামের ব্যাখ্যা মানে না; বরং সর্বক্ষেত্রে সরাসরি হাদীস মানার দাবী করে থাকে তাদের কাছে সবিনয় আরয, আপনাদের মতানুযায়ী তো মুক্তাদীর ফাতিহা পড়া ছাড়া নামায হবে না। অর্থাৎ মুক্তাদীকে ইমামের পিছনেও সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। এখন প্রশ্ন হল, যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে উপস্থিত হয়ে দেখে যে, ইমাম সাহেব কিরা‘আত শেষ করে রুকুতে চলে গেছেন, তখন তার করণীয় কী হবে? অর্থাৎ তার ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? যদি বলেন, সে রুকুতে শরীক হয়ে রুকুতেই ফাতিহা পড়ে নিবে তাহলে সেটা হাদীসের খিলাফ হবে। কেননা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু সিজদার মধ্যে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন। আর ফাতিহা কুরআনের অংশ হওয়াটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। সুতরাং রুকুতে ফাতিহা পড়া যাবে না। (তিরমিযী,হা.নং ২৬৪)। ইমাম তিরমিযী রহ. এই হাদীসকে *হাসানুন সহীহুন* বলেছেন। যদি বলেন যে, সে ব্যক্তি এ রাকাআতে শরীক হবে না; বরং দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে তারপর পরবর্তী রাকাআত থেকে ইমামের ইকতিদা করবে। তাহলে এটাও হাদীসের লঙ্ঘন হবে। কারণ, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামকে যে অবস্থায় পাওয়া যায় সে অবস্থায় তার ইকতিদা করতে বলেছেন। (তিরমিযী,হা.নং ৫৯১)। আলবানী সাহেবও এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। (সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা, হা.নং ১১৮৮)। কাজেই নিছক দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। আর যদি বলেন, সে ইমামের সাথে শরীক হবে কিন্তু এই রাকাআতটি গণনা করবে না তাহলে সেটাও হাদীসের খিলাফ হবে। কারণ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ পেলে রাকাআত গণনা করতে বলেছেন। (আবূ দাঊদ, হা. নং ৮৯৩। আলবানী সাহেবও হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।) অতএব রুকূ পেলে রাকাআত গণনা না করার উপায় নেই। আর যদি শেষতক বলে বসেন, এ ব্যক্তি ফাতিহা না পড়ে ইমাম যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই তার ইকতিদা করবে। তাহলে এটা স্বয়ং আপনাদের দাবীর খিলাফ হবে। কারণ আপনাদের দাবী ছিল, ফাতিহা পড়া ছাড়া মুক্তাদীর নামাযই হয় না। সুতরাং এই উত্তরেরও অবকাশ নেই। তো আখের যাবেনটা কোথায়?

এবার বলুন, কোন ব্যক্তি যদি এমন সময় মসজিদে আসে যখন ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহার শেষাংশ ولا الضالين পড়ছেন, তখন তার করণীয় কি হবে? আপনারা যেহেতু হাদীস মানেন তাই হাদীস অনুযায়ী উত্তর দেয়াই সমীচীন হবে। যদি বলা হয়, ইমামের সাথে সেও ‘আমীন’ বলবে। যেমন হাদীসে এসেছে, ইমাম যখন ولا الضالين বলে তখন তোমরা ‘আমীন’ বল। (সহীহ বুখারী, হা. নং ৭৮২)। তাহলে বলব, তার জন্য তো ফাতিহা পড়া জরুরী। ফাতিহা না পড়লে তো তার

নামাযই হবে না। কাজেই ফাতিহা না পড়ে কিভাবে সে 'আমীন' বলবে? আর যদি বলা হয়, সে ইমামের ولا الضالين বলা সত্ত্বেও 'আমীন' বলবে না; বরং আগে ফাতিহা পড়বে তারপর একাকী 'আমীন' বলবে। তাহলে বলব, 'ইমাম যখন ولا الضالين বলে তখন তোমরা 'আমীন' বল।' এই হাদীসের উপর কিভাবে আমল হবে?

আহলে হাদীস ভাইয়েরা কোন হাদীসের সঙ্গে সংঘর্ষ না বাধিয়ে এই প্রশ্নগুলোর গ্রহণযোগ্য উত্তর দিতে পারলে আমরা খুশি হব। আর যদি এগুলোর কোন গ্রহণযোগ্য সমাধান তাদের জানা না থাকে তাহলে আমরা তাদেরকে ফিকহী মাসাইলের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাব অনুসরণ করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। সেক্ষেত্রে তাদের কোন হাদীসেরই বিরোধিতা করতে হবে না। কেননা উল্লেখিত সকল হাদীস বিবেচনায় রেখে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত হল, ফাতিহা পড়া ছাড়া নামায না হওয়ার হাদীসটি ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য প্রযোজ্য। অতএব মুক্তাদী এসে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সে অবস্থায়ই তার সাথে শরীক হয়ে যাবে। তার জন্য ফাতিহা পড়ার প্রয়োজন নেই। অনুরূপ হানাফী মুক্তাদীর জন্য আমীন বলতেও কোন ঝামেলা নেই। কেননা তার জন্যও ফাতিহা পড়ার বিধান নেই। কাজেই সে ইমামের ولا الضالين শোনে 'আমীন' বলতে পারবে। আর এতে তাকে কোন হাদীসের বিরোধিতাও করতে হবে না। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং সীরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়েম ও দায়েম থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন ॥

বয়ান-২

২৮ মার্চ ২০১৫ খ্রি. রোজ শনিবার, লালবাগ চৌরাস্তার পার্শ্বে আইম্মায়ে মাসাজিদ, উলামায়ে কিরাম ও স্থানীয় জনগণের যৌথ-উদ্যোগে এক বিরাট দীনী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলে রাত ১১.০০ হতে ০১.৩০ পর্যন্ত দীর্ঘ ও সারগর্ভ বয়ানে হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. বর্তমান লা-মাযহাবীদের সৃষ্ট বিভ্রান্তিসমূহের দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান করেছিলেন। মূল্যবান বয়ানটি দেশব্যাপী সকল হক্বপছন্দ ও সত্যানুসন্ধানীর হাতে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যেই এ প্রয়াস।

হামদ ও সালাতের পর।

সূচনা

বর্তমানে আহলে হাদীসদের দৌরাত্ম চরম পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। কুলি-মজুর, দর্জি, রিক্সাওয়ালা, সুইপার সবাই নাকি আহলে হাদীস। কী তাজ্জবের কথা! আরে সহীহ বুখারী খুলে দিলে পড়তে পারবে তোমরা? দশ লক্ষ টাকা চ্যালেঞ্জ করলাম, বংশালের কোনো আহলে হাদীস সহীহ বুখারী পড়তে পারবে না। সহীহ বুখারীতে যের-যবর দেয়া নেই, সেটা গ্রামার দিয়ে পড়তে হয়। তুমি-তো আরবী গ্রামার

পড়োনি, তোমার-তো সহীহ বুখারী পড়ারই যোগ্যতা নেই, অথচ তুমিই কি-না আহলে হাদীস! কতো বড়ো প্রতারণা, কতো বড়ো ধোঁকাবাজি! কয়েকদিন আগে উলামায়ে কিরাম আমাকে জানালেন, আহলে হাদীস নামক ফিরকাটি এ এলাকার মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে চলেছে, মানুষকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সময় না থাকা সত্ত্বেও আমি আসতে সম্মত হয়েছি। কারণ আমার উপর এ এলাকাবাসীর একটা হক্ব আছে। আমি লালবাগ মাদরাসারই একজন ফারেগ। এখান থেকে দাওরায়ে হাদীস পড়েছি। মুফতী 'আব্দুল মুঈয সাহেব রহ.'-যিনি বাইতুল মুকাররমের খতীব ছিলেন, তার কাছে দুই বছর ইফতা পড়েছি। পড়াশোনা শেষে এ মাদরাসাতেই আট বছর শিক্ষকতা করেছি। এ এলাকায় অনেক চলাফেরা হয়েছে। অনেক বছর আমি কেল্লার মসজিদের খতীব ও ইমাম ছিলাম। রিযিক যেখানে থাকে মানুষকে সেখানে চলে যেতে হয়। একসময় আমার রিযিক মুহাম্মাদপুর চলে গেছে, আমিও মুহাম্মাদপুর চলে গেছি। এখন আল্লাহ সেখানে রেখেছেন। যতোদিন সেখানে রিযিক আছে, থাকবো। যদি অন্য কোথাও রিযিক চলে যায়, তাহলে সেখানে চলে যেতে হবে।

যা বলছিলাম, আমার উপর এ এলাকার ভাইদের একটা হক্ব আছে। আমি একটানা দশ বছর এ এলাকার আলো-বাতাস গ্রহণ করেছি। আজকে তারা আমাকে স্মরণ করেছে। এজন্য আমি তাদের ডাকে লাব্বাইক বলে সাড়া দিয়েছি। হাদীসের দরস সংক্ষেপ করে চলে এসেছি। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এ মাজলিসকে কবূল করুন। আমাদের সকলকে হক্ব বোঝার তাওফীক দান করুন এবং বাতিলের খপ্পর থেকে হিফাযত করুন।

বাতিল প্রতিরোধে উলামাদের দায়িত্ব

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত হক্বের একটা রাস্তা থাকবে, পাশাপাশি বাতিলেরও অনেকগুলো রাস্তা থাকবে। আয়াতে কারীমায় হক্বের রাস্তা বলা হয়েছে একটি। আর বাতিল রাস্তা বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বহুবচন ব্যবহার করেছেন। বোঝা গেলো, বাতিলের অনেকগুলো রাস্তা থাকবে। এ অবস্থায় উলামায়ে কিরামকে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন দু'রকম দায়িত্ব দিয়েছেন। একটা হলো, মুসলমানদেরকে ঈমান-আমল শিক্ষা দেয়া। অর্থাৎ জনসাধারণকে তারা ঈমানও শিক্ষা দিবে; নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, হালাল রিযিক এবং পিতা-মাতা, বিবি-বাচ্চার হক্বও শিক্ষা দিবে। আর অপরটা হলো, এই যে বললাম, বাতিলের অনেকগুলো রাস্তা আছে, কখনও যদি কোনো বাতিল রাস্তা প্রকাশ পায়, কোনো বাতিল মুসলমানদের উপর হামলা করে তখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঐ বাতিলের মুকাবেলা করবে এবং তাকে দাফন করে দিবে। ঠিক যেমনটি হাদীসে পাকে এসেছে-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.

(সুনানে কুবরা লিল-বাইহাকী; হাদীস নং ২০৯১১)

এ হাদীসে বলা হয়েছে, হক্কানী উলামায়ে কিরাম এবং আল্লাহওয়ালাগণ কয়েকটি কাজ করবে। সেগুলোর মধ্যে প্রথমটি হলো, تحريف الغالين অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে যারা বাড়াবাড়ি করে, তাদেরকে তারা প্রতিহত করবে। এখন আমাদেরকে জানতে হবে, বর্তমানে দীনের ব্যাপারে কারা বাড়াবাড়ি করছে।

১. রিজভী ফিরকা : মাজার-পূজারী এবং মিলাদ-কিয়ামকারীরা যারা বলে, কিয়াম না করলে কাফির হয়ে যায়-এরা হলো বাড়াবাড়িকারী। কিয়াম না করলে মানুষ কাফির হবে কেনো? দুরূদ-তো দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে-শুয়ে এমনকি হাঁটা-চলা অবস্থায়ও পড়া যায়। নামাযে-তো বসে বসেই দুরূদ পড়তে হয়। আর নামায হলো সর্বোত্তম আমল। তাহলে বোঝা গেলো, দুরূদ শরীফ বসে পড়া উত্তম। এখন কথা হলো, দুরূদ পড়তে পড়তে এরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায় কেনো? তারা বলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে আগমন করেন, তাই আমরা দাঁড়িয়ে যাই। ওরা কীভাবে দেখলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের মিলাদ মাহফিলে আগমন করেছেন!? এটা ভন্ডামী বৈ কিছু নয়। এটা একটা বাতিল ফিরকা। এ বাতিল ফিরকার মূল ব্যক্তি ছিলো আহমদ রেযা খান। এ লোকটিকে ইংরেজরা খরিদ করে নিয়েছিলো। ইংরেজরা তাদের শাসনামলে চারজন লোককে খরিদ করেছিলো। তাদের মধ্যে এ হচ্ছে একজন। এরা কথায় কথায় মানুষকে কাফির বানায়। যেমন : দেওবন্দী উলামায়ে কিরাম কাফির, আশরাফ আলী থানভী রহ. কাফির, রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. কাফির। নাউযুবিল্লাহ।

আহলে কাশফ বুযুর্গানে দীন বলেছেন, আকাবিরে দেওবন্দের মধ্যে সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে পথচলার যোগ্যতা ছিলো। আল্লাহ তা‘আলা শেষ যামানার লোকদের সামনে পূর্বের যামানার লোকদের ঈমান-আমল প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে পরে পাঠিয়েছেন, অথচ তারা সবাই এদের দৃষ্টিতে কাফির! আল্লাহ আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন যে, তোমরা কাফিরদেরকে মুসলমান বানাও। আর এ লোকগুলো সব মুসলমানকে কাফির বানিয়ে দিচ্ছে। আমাদের দেশে এ দলটির নাম রিজভী। আর পাকিস্তানে এদের নাম বেরেলভী। এরা মাজার-পূজারী, জশনে-জুলুসে ঈদে-মীলাদুন্নবী পালনকারী। এরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে।

২. আহলুল হাদীস ফিরকাঃ আরেকটা দল যারা বাড়াবাড়ি করে তারা আহলুল হাদীস নামে পরিচিত। পৃথিবীতে চারটা মাযহাব বহু শতাব্দী যাবত মিল-মুহাব্বতের সাথে বিদ্যমান আছে। জেদ্দা কোন সাগরের তীরে অবস্থিত? লোহিত

সাগর। ইংরেজিতে বলা হয় রেড সী। ঐ সাগরের পশ্চিম দিকে যতো দেশ আছে যথা- আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মৌরিতানিয়া, মরক্কো এসব দেশের লোকজন মালেকী মাযহাব মেনে চলে। আরব ভুখন্ডে বর্তমানে হাম্বলী মাযহাব প্রচলিত। এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ দেশের মানুষ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী দীন পালন করে। হানাফী মাযহাবের লোক দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি। ওদিকে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় আছে শাফিঈ মাযহাব। এভাবে পুরা দুনিয়ার মুসলমানগণ মাযহাব মেনে চলে। বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের মাযহাব ভিন্ন ভিন্ন হলেও ঈমানের প্রশ্নে এরা সকলেই একাট্টা। এই শুধু 'আমীন' জোরে বলবে, না আস্তে বলবে এ জাতীয় সামান্য কিছু পার্থক্য এদের মধ্যে বিদ্যমান। এদের প্রত্যেকের আমলের উপর কুরআন-সুন্নাহর দলীল আছে। এদের কেউই ভুলের উপর নয়। চার মাযহাবই হক্ব ও সঠিক। চার মাযহাবকেই সহীহ ইসলাম বলতে হবে। বলুন, চার মাযহাবকে কী বলা হবে? সঠিক ইসলাম। আমরা মিল-মুহাব্বতের সাথে ছিলাম এবং আছি। কেউ কাউকে কাফির বলিনি। কেউ কাউকে অযোগ্য বলিনি। আমাদের এ মিল-মুহাব্বত ইংরেজদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ালো। আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ফায়দা লুটার জন্য ইংরেজরা একটা ফিরকার জন্ম দিলো। যার মাধ্যমে তারা এ কাজটি সম্পন্ন করলো তার নাম ছিলো মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী। ইংরেজরা তাকে খরিদ করে নিয়েছিলো (এ হচ্ছে ইংরেজদের খরিদ করা দ্বিতীয় ব্যক্তি)। এ ব্যক্তি আহলুল হাদীস নামটা ইংরেজ গভর্নর থেকে পাস করিয়ে নিয়েছিলো। তারা চার মাযহাবের অনুসারীদেরকে বলে, 'তোমরা মুশরিক হয়ে গেছো। তোমরা যে ইমাম মানছো এটা শিরক। মাযহাব মেনে তোমরা শিরক করছো। তোমরা সবাই কাফির হয়ে গেছো'। এদের ভাষ্যমতে পুরা দুনিয়ার মুসলমানরা কাফির হয়ে গেছে। আর ঈমানদার শুধু এরা ১০/১৫ জন। এটা হয়!? সেই আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান চার মাযহাবে বিভক্ত। এরা সবাই কাফির? আর ওরা কয়েকজন শুধু মু'মিন? সবাইকে কাফির বানানোর এই ঠিকাদারী তাদেরকে কে দিয়েছে? তারা সবাইকে কাফির বলছে, এটা কি ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি নয়?

শরী'আতের দলীল ও আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের অবস্থা

শরী'আতের দলীল কয়টা? চারটা। যেকোনো তালেবে 'ইলমকে জিজ্ঞাসা করুন। প্রত্যেকটি কিতাবেই আছে শরী'আতের দলীল চারটি। সেগুলো হলো : কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও ক্বিয়াস। এরা ইজমা ও ক্বিয়াসকে শরী'আতের দলীল মানে না। অথচ ইজমা-ক্বিয়াসের শর'ঈ দলীল হওয়া কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। তারা বলে, আমরা শুধু কুরআন-হাদীস মানি। আচ্ছা, কুরআন যখন মানো তাহলে কুরআনের সবকিছু কি মানতে হবে না? নাকি নিজেদের মন মতো দু' চারটা আয়াত মানলেই হবে? কুরআন-তো আমাদের ইজমা মানতে বলেছে। আমি দলীল পেশ করবো যে, কুরআন আমাদেরকে ইজমা মানতে বলেছে।

মাযহাব মানার বিষয়টা অর্থাৎ ইজমা-ক্বিয়াস মানার বিষয়টা কুরআন এবং সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আহলুল হাদীসরা ইজমাও মানে না, ক্বিয়াসও মানে না। চার দলীলের দুটি না মেনে এরা অর্ধেক ইসলামকেই অস্বীকার করছে। বলুন, এতে কি তারা ঈমানদার হতে পারবে? আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে বলেছেন,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ.

অর্থঃ তোমরা অর্ধেক মানো আর অর্ধেক মানো না; এতে তোমরা মু’মিন হতে পারবে না। (সূরা বাকারা- ৮৫)

বলুন! পুরা কুরআন মানতে হবে, নাকি অর্ধেক মানলেই হবে? তারা কুরআনে বর্ণিত ইজমার আয়াত, ক্বিয়াসের আয়াত মানছে না। আর আমরা মানি বলে আমাদেরকে বলে মুশরিক। আমরা আয়াতগুলো মেনে মুশরিক হলাম আর তারা না মেনে ঈমানদার হলো? নাউযুবিল্লাহ।

রিজভী আর আহলুল হাদীসদেরকে পূর্বোল্লেখিত হাদীসে বাড়াবাড়িকারী বলা হয়েছে। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী বাড়াবাড়িকারীদেরকে প্রতিহত করা হক্কানী উলামায়ে কিরামের দায়িত্ব।

উলামায়ে কিরামের দ্বিতীয় দায়িত্বটি হচ্ছে, انتحال المبطلين অর্থাৎ বাতিল পন্থীদেরকে বাতিল ঘোষণা করা। হাদীসে এসেছে, বাতিল পুরোটাই বাতিল। আমাদের যুগে বাতিল কারা? কাদিয়ানীরা অর্থাৎ যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসালামকে শেষ-নবী না মেনে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে নবী মানে। আরেক দল বাতিল হলো শি‘আরা। অর্থাৎ এরাও বাতিল তথা কাফির। শি‘আরা আমাদের কুরআনকে অরিজিনাল কুরআন মনে করে না। তারা বলে, অরিজিনাল কুরআনে ১৭ হাজার আয়াত থাকবে। আর আমাদের কুরআনে আছে ৬ হাজার ২ শত ৩৬ টি আয়াত। অরিজিনালটা নাকি তাদের বারোতম ইমামের কাছে আছে। প্রশ্ন হলো, তাদের সেই ইমাম অরিজিনাল কুরআন নিয়ে কোথায় আছেন? শি‘আদের এক গ্রুপ বলছে, তিনি মেঘের মধ্যে আছেন। আরেক গ্রুপ বলছে, ইরাকের ‘সুররা মান রওয়া’ নামক একটা পাহাড়ের গুহায় তিনি লুকিয়ে আছেন। পুরা এলাকায় যখন শি‘আদের শাসন কায়েম হবে তখন তিনি বের হবেন। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ শি‘আ। ইরাকের ক্ষমতাও এখন শি‘আদের হাতে। এজন্য শি‘আরা পুরা ইরাক তাদের দখলে আনতে চাচ্ছে। লেবাননের হিজবুল্লাহ গ্রুপ শি‘আপন্থী। এরা কেউই বর্তমান কুরআন মানে না। কুরআনে আম্মাজান আয়িশা রাযি.কে পবিত্র বলা হয়েছে। আর তাদের কিতাবে আছে, তারা ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে পারলে মা আয়িশা রাযি.কে কবর থেকে উঠিয়ে ১০০ ঘা বেত মারবে (নাউযুবিল্লাহ)। তিনি নাকি (নাউযুবিল্লাহ) যিনা করেছিলেন। কুরআন যেখানে আয়াত নাযিল করে বলে দিলো যে, ঘটনাটি জঘন্য একটি অপবাদ এবং এটি মুনাফিকদের মিথ্যা প্রোপাগান্ডা। সেখানে তারা

বলছে, এটা সত্য নয়; বরং আয়িশা রাযি. সত্যি সত্যিই অন্যায় করেছেন। এরপরও তারা কীভাবে কুরআন মানলো এবং এরপরও তারা কীভাবে মুসলমান থাকে? কুরআনের একটা আয়াত কিংবা অর্ধেক আয়াত অস্বীকার করলেও কারো ঈমান থাকে? হাদীসের মধ্যে বর্ণিত ইনতিহালুল মুবতিলীনের মধ্যে কাদিয়ানী আর শি'আরা অন্তর্ভুক্ত। উলামায়ে কিরামকে এ উভয়পক্ষের মুকাবেলা করে তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে।

হাদীসের পরবর্তী অংশ وتاويل الجاهلين এর তাবিল মানে হলো, তাফসীর। আর জাহেল মানে যার তাফসীর করার যোগ্যতা নেই। তাফসীর করতে হলে পনেরোটা সাবজেক্টে জ্ঞান থাকতে হবে। অর্থাৎ কারো পনেরোটা সাবজেক্টে জ্ঞান থাকলে তবেই সে তাফসীর করতে পারে। আমাদের কওমী মাদরাসাগুলোতে (দেওবন্দী মাদরাসাগুলোতে) ঐ পনেরোটা বিষয়কে ধাপে ধাপে পড়ানো হয়, যাতে প্রতিটি ছাত্রের মধ্যেই কুরআনের তাফসীর বোঝার ও তাফসীর করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। দেওবন্দী মাদরাসার সিলেবাস সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেলেন তো!? পনেরোটা বিষয়ের জ্ঞান না থাকলে তাফসীর বোঝা যায় না। সুতরাং নাহব, সরফ, ইশতিকাক, বয়ান, মা'আনী, বদী, কিরা'আত, লুগাত, কাসাস, নাসেখ-মানসূখ, হাদীস, ফিক্বহ, আক্বাইদ ইত্যাদি শাস্ত্রে যার দক্ষতা নেই সে যদি তাফসীর করে তাহলে তাকে কী বলা হবে? জাহেলের তাফসীর। আমাদের আলোচ্য হাদীসের মর্ম ও প্রয়োগক্ষেত্র প্রত্যেক যামানায়ই পাওয়া যাবে। আমদের যামানায় تاويل الجاهلين কথাটা পাওয়া যাচ্ছে দুজন ব্যক্তির মধ্যে। একজন হলো জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মিস্টার মওদুদী। তিনি তাফহীমুল কুরআন নামে একটি বই লিখেছেন। আর বর্তমানে ডা. জাকির নায়েক যে তাফসীর করছে এটাও হাদীসে বর্ণিত জাহেলদের তাফসীরের অন্তর্ভুক্ত। জাকির নায়েক একজন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার। তাফসীর করার কোনো অধিকার তার নেই। তিনি কেনো ফাতাওয়া দিতে যাবেন? ফাতাওয়া দেয়াতো আমার বা আমাদের কাজ। লালবাগে আমি আট বছর ফাতাওয়া দিয়েছি। আমার কাজ যদি কোনো ডাক্তার সাহেব ছিনিয়ে নেয় তাহলে আমি সেই ডাক্তারকে বলবো, আপনার পেটে টিউমার হলে আমি মুফতী সাহেব সেটার অপারেশন করবো। আপনি ডাক্তার হয়ে যদি ফাতাওয়া দিতে পারেন যেটা আপনার কাজ নয়, তাহলে আমি মুফতী হয়ে কেনো আপনার পেট কাটতে পারবো না? আপনারা এসব জাকির নায়েকদেরকে বলুন, তোমাদের অসুখ হলে পেট কাটবে আমাদের মুফতী সাহেব। তখন হয়তো তাদের হুঁশ ফিরবে।

মোটকথা, আলোচ্য হাদীসে উলামায়ে কিরামকে তিন ধরনের ফিরকা প্রতিহত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। প্রথম প্রকার হলো রিজভী ও আহলুল হাদীস। দ্বিতীয় প্রকারে আছে কাদিয়ানী ও শি'আ। আর তৃতীয় প্রকারে আছে মওদুদী ও জাকির নায়েক সাহেব। বর্তমানে এ ছয়টি ফিরকাকে মুকাবিলা করা এবং এদের সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করা প্রত্যেক আলেমের ঈমানী দায়িত্ব। এ ব্যাপারে

আমাদের আলেম সমাজকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আমরা আলেমরা যদি মুখ না খুলি বা ভয় পাই; তাহলে আমরা কিসের ওয়ারিশে আম্বিয়া হলাম? আমাদের জীবনতো আল্লাহর জন্য ওয়াকফকৃত। আল্লাহর জন্য জান দিতে হলে প্রয়োজনে শহীদ হবো। আশ্চর্যের কী? হায়াত থাকতে কেউ কোনোদিন মরে? তাহলে ভয় কিসের? আল্লাহর দীনের কথা বলবো, হক্ব কথা বলবো। হক্ব কথা না বললে জনগণ কি বাতিল ফিরকার খপ্পরে পড়ে ঈমান নষ্ট করবে না? তারা ঈমান নষ্ট করবে এবং হাশরের ময়দানে উলামায়ে কিরামকে দোষী সাব্যস্ত করবে যে, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন! আমাদের এলাকায় বড়ো বড়ো আলেম ছিলো, বড়ো বড়ো মাদরাসা ছিলো; কিন্তু বাতিল যে ইসলামের দুশমন, এসব আলেম আমাদেরকে তা খুলে খুলে বলেনি। হাশরের ময়দানে সাধারণ মুসলমানগণ আমাদেরকে দোষারোপ করবে। সেই দোষারোপ থেকে বাঁচতে হলে বাতিলের মুখোশ উন্মোচন করে জনগণকে বাতিল চিনিয়ে দিতে হবে কারা ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের এজেন্ট এবং ঈমান বিনষ্টকারী। এ গুরু-দায়িত্ব পালনের তাগিদেই উলামায়ে কিরাম আমাদেরকে আজ ডেকেছেন। গোটা লালবাগের ইমাম সাহেবগণ ও লালবাগ মাদরাসার শিক্ষকগণ মিলে আপনাদের সকলকে দাওয়াত দিয়েছেন। আশাকরি, এতক্ষণে আপনারা আজকের মাহফিলের উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পেরেছেন।

এখন এসব বাতিলের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পালা। যে ছয়টা বাতিলের কথা আপনাদেরকে বললাম রিজভী, আহলুল হাদীস, শি'আ, কাদিয়ানী, মওদুদী ও জাকির নায়েক, এগুলোর প্রত্যেকটার পুরোপুরি ব্যাখ্যা দিতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। আজকে আমাদের মূল এজেন্ডা হলো, তথাকথিত আহলুল হাদীসদের মুখোশ উন্মোচন। এজন্য আমি আল্লাহ প্রদত্ত 'ইলম অনুযায়ী শুধু এ ব্যাপারেই কিছু আলোচনা করতে চাই।

আহলে হাদীস বনাম আহলুস সুন্নাহ

প্রথম কথা হলো, ওরা নিজেদেরকে আহলুল হাদীস বলে পরিচয় দেয়। আর আমরা আমাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলে ব্যক্ত করি। এখানে দুটি বিষয় আমাদের সামনে আসলো। একটি হলো আহলে হাদীস, আরেকটি হলো আহলে সুন্নাত। কাজেই আমাদেরকে জরুরী ভিত্তিতে হাদীস আর সুন্নাতের পার্থক্য বুঝতে হবে। এ ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আগে এই পার্থক্য না বুঝলেও চলতো, কিন্তু এখন আর না বুঝলে চলবে না। আপনি আলেম হোন বা না হোন বাধ্যতামূলকভাবেই হাদীস কী আর সুন্নাত কী তা আপনাকে জানতে হবে। খুব সংক্ষেপে বলবো, আপনারা খেয়াল করে বুঝে নিবেন।

হাদীস কাকে বলে? হাদীস হলো সাগর-মহাসাগর তুল্য। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের তেইশ বছরে যা বলেছেন, যা

করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামের যেসব কাজ তিনি সমর্থন করেছেন এ সবকিছুকেই হাদীস বলে। তাহলে সুন্নাত কাকে বলে? সুন্নাত হলো এ সাগরের একটা অংশ বিশেষের নাম। প্রশ্ন হলো : সেটা কোন অংশ? হাদীসের মহাসমুদ্র থেকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. দশ লক্ষ হাদীস জানতেন। ইমাম বুখারী রহ. ছয় লক্ষ হাদীস জানতেন। এসব হাদীস থেকে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী বাছাই করে কিছুসংখ্যক হাদীস তারা তাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের জানা এবং লিখা এ লক্ষ লক্ষ হাদীসের সবগুলোই সুন্নাত নয়। সুন্নাত হলো ঐ সকল হাদীস যেগুলো নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের আমলের জন্য অর্থাৎ আপনার আমার আমলের জন্য বলেছেন। যেগুলো তিনি আপনার আমার আমলের জন্য বলেননি, কিন্তু হাদীসের কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে সেগুলোকে সুন্নাত বলা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, হাদীসের সব কিতাবেই আছে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে এগারোটি বিবাহ করেছিলেন। সব হাদীসের কিতাবেই যেহেতু এটা আছে, সেহেতু এটা একটা হাদীস। কিন্তু তিনি কি আমাদেরকে এ হাদীসের উপর আমল করার অনুমতি দিয়েছেন? দেননি। তিনি আমাদেরকে শর্ত সাপেক্ষে সর্বোচ্চ চারটি বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন, এগারোটির অনুমতি দেননি। তাহলে এগারো বিবির আলোচনা সম্বলিত বর্ণনাটি নিঃসন্দেহে হাদীস, কিন্তু সুন্নাত নয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমালে তাঁর উযূ নষ্ট হতো না। এটা হাদীস এবং তা বহু কিতাবে আছে। কিন্তু আমরা ঘুমালে কি উযূ থাকবে? থাকবে না। এটাকে হাদীস বলা যাবে, কিন্তু সুন্নাত বলা যাবে না। 'শর্তসাপেক্ষে সর্বোচ্চ চার সংখ্যক বিবাহ করো'-এটা হাদীসও, আবার সুন্নাতও। এটা কুরআনেও আছে, হাদীসেও আছে। 'যে ব্যক্তি চিৎ হয়ে বা কাত হয়ে ঘুমালো, তার উযূ ভেঙ্গে গেলো'-এটা হাদীস এবং সুন্নাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো চিৎ বা কাত হয়ে ঘুমালে উযূ ভাঙেনি (কিন্তু আপনার আমার ভাঙবে)। হাদীসের কিতাবে আছে, তাই এটা হাদীস। আর আপনার আমার জন্য বলেছেন, ঐ অবস্থায় উযূ ভেঙে যাবে। তাই এটা সুন্নাত।

গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করার অনুমতি হযরত 'আলী রাযি.-এর জন্য নির্দিষ্ট। একথা হাদীসে বর্ণিত আছে। কিন্তু আপনার আমার জন্য কি এর অনুমতি আছে? নেই। তাহলে এ অবস্থায় মসজিদে প্রবেশের অনুমতি না থাকার হাদীসটি সুন্নাত। আর 'আলী (রাযি.) যে প্রবেশ করতে পারতেন সেটা হাদীস; সুন্নাত নয়।

তাহলে দেখা গেলো, **কোনো হাদীস সুন্নাত হওয়ার জন্য এক নম্বর শর্ত হলোঃ** বর্ণনাটি 'আম উম্মতের জন্য হতে হবে। যেটা নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট বা কোনো সাহাবীর জন্য নির্দিষ্ট সেটা শুধুই হাদীস; সুন্নাত নয়।

কোনো হাদীস সুন্নাত হওয়ার দুই নম্বর শর্ত হলোঃ সেটা রহিত না হতে হবে। ইসলাম একদিনেই পূর্ণতা লাভ করেনি। পর্যায়ক্রমে আস্তে আস্তে দীর্ঘ তেইশ বছরে পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। একটা সময় ছিলো, যখন নামাযের মধ্যে কথা বলা যেতো। লোকেরা এসে জিজ্ঞেস করতো, ভাই সাহেব! নামায কতো রাকা'আত হয়েছে? নামাযী উত্তর দিতো, দুই রাকা'আত বা তিন রাকা'আত। উত্তর জেনে প্রশ্নকারী আগে একা দুই বা তিন রাকা'আত পড়ে নিতো। তারপর জামা'আতে শরীক হয়ে যেতো। এটা হাদীসের কিতাবে আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি এখন এরূপ করা চলবে? আহলে হাদীসরা বলে তারা নাকি সহীহ হাদীস মানে। এ বর্ণনা তো সহীহ হাদীসেও আছে। কিন্তু সহীহ হাদীসে থাকলেই কি এখন তা মানা যাবে? দেখতে হবে না, নিয়মটি বাদ হয়ে গেছে নাকি বহাল আছে?

সহীহ বুখারী শরীফের হাদীসে আছে- তোমার ইমাম যদি কোনো ওজরের কারণে বসে নামায পড়ায় তাহলে তোমরা সবাই বসে ইকতিদা করো। এ হাদীস সহীহ বুখারী শরীফের ছয় জায়গায় আছে।

وان صلى جالسا فصلو جلوسا اجمعون

অর্থঃ তোমাদের ইমাম যদি বসে নামায পড়ায় তুমিও বসে নামায পড়ো। (সহীহ বুখারী; হাদীস নং ৭২২)

কিন্তু এটা এখনো বহাল আছে, না রহিত হয়ে গেছে? রহিত হয়ে গেছে। কীভাবে বুঝা গেলো? নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকালের আগে অসুস্থাবস্থায় এক ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করেছেন। তিনি বুধবার ইশার সময় অসুস্থ হয়েছেন, আর সোমবার দুপুরে ইন্তিকাল করেছেন। এর মধ্যে একদিন যুহরের নামাযে গিয়েছেন এবং বসে নামায পড়িয়েছেন। আওয়াজ এতো দুর্বল ছিলো যে, আবু বকর সিদ্দীককে মুকাব্বির হিসেবে তাকবীর দেয়ার জন্য নিজের পাশে রেখেছেন। প্রথম কাতারে দাঁড় করাননি। অসুস্থতার দরুন আওয়াজ এতো হালকা ছিলো যে, প্রথম কাতারের মুসল্লিরাও শুনতে পাবে না। তাই তাকে পাশে দাঁড় করিয়েছেন। ঐদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে বসে নামায পড়িয়েছেন, আর অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার ইকতিদা করেছেন। তাহলে সহীহ বুখারীর ঐ হাদীস যা কিতাবের ছয় জায়গায় এসেছে (অর্থাৎ ইমাম বসে নামায পড়লে তোমরাও বসে নামায পড়ো।) তা কি আছে, না রহিত হয়ে গেছে? রহিত হয়ে গেছে। এ হাদীসকে কি এখন সুন্নাত বলা যাবে? বুঝে-শুনে উত্তর দিন। এখানে আমি সহীহ বুখারীর ক্লাস নিচ্ছি। এটা কোনো ওয়াজ মাহফিল নয়। সহীহ বুখারীর ক্লাস সংক্ষিপ্ত করে এখানে এসেছি, তাই আপনাদেরকেও সহীহ বুখারী পড়াচ্ছি। উত্তর হলো: এটা হাদীস বটে, কিন্তু সুন্নাত নয়। সুন্নাত হতে হলে শর্ত হলো, হাদীসটি রহিত না হতে হবে। এমন আরও বহু হাদীস রহিত হয়ে গেছে। যেমন : ইসলামের শুরুর যামানায় নবীজী সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, তোমরা যদি বিবির কাছে যাও, আর তার সঙ্গে সবকিছুই হয় শুধু বীর্যপাত না হয়, তাহলে তোমাদের গোসল করা লাগবে না। (সহীহ মুসলিম; হাদীস নং ৩৪৩)

কিন্তু এটা কি এখনো বহাল আছে? নেই। সব কর্মকান্ড শেষ করলো, শুধু একটু বাকী রাখলো তাতেই গোসল মাফ হয়ে যাবে? যাবে না। অন্য হাদীসে দেখুন। আম্মাজান আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত,

اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا.

অর্থঃ স্বামী-স্ত্রীর খতনার স্থান যদি একত্রিত হয় তবে গোসল ফরয হয়ে যাবে (আরব দেশে নারীদেরকেও খতনা করানো হয়)। মা আয়িশা রাযি. বলেন, আমার এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে এমনটি হয়েছিলো; তখন আমরা গোসল করে নিয়েছি। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস নং ১০৮)

তাহলে বীর্যপাত বিহীন সহবাসে গোসল ফরয না হওয়ার বিধানটি এ হাদীস দ্বারা বাদ হয়ে গেলো। তাই সাবধান! আপনারা নিজেরা সহীহ বুখারী শরীফ রিসার্চ করতে যাবেন না। তাহলে বিপদে পড়বেন। আপনারা সুন্নাতের কিতাব পড়বেন। সুন্নাত আর ফিক্বহ একই জিনিস। ফিক্বহের মধ্যে হাদীসসমূহ থেকে বাছাই করে করে সুন্নাতগুলো এক জায়গায় জমা করা হয়েছে। সহীহ বুখারী-তো হাদীসের কিতাব। এখানে সুন্নাতের সঙ্গে রহিত হাদীসগুলোও লেখা আছে। নবুওয়াতের তেইশ বছরের অনেক কিছু সহীহ বুখারীতে আছে। একটু আগে আমি যে হাদীসটি বললাম, সবকিছু হওয়ার পরও বীর্যপাত না হলে গোসল করা লাগবে না, এটা সহীহ বুখারীতে দুই জায়গায় আছে। আপনারা যদি একা একা সহীহ বুখারী পড়েন তাহলে এ হাদীস দেখে-তো আপনারা আর ঐ অবস্থায় গোসল করবেন না। কারণ আপনারা বুঝবেন না যে, এটা রহিত হয়ে গেছে। আমি আপনাদেরকে অনেকগুলো উদাহরণ দিয়ে বোঝালাম যে, হাদীসের কিতাবে থাকা সত্ত্বেও অনেক হাদীসের বিধান রহিত হয়ে গেছে। সেগুলোকে হাদীস-তো বলা যাবে, কিন্তু সুন্নাত বলা যাবে না।

কোনো হাদীস সুন্নাত হওয়ার তিন নম্বর শর্ত হলোঃ বর্ণিত হাদীসের বিধানটি ওযরবশত না হতে হবে। ওযর-আপত্তি বুঝেন তো? কোনো কোনো কাজ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাময়িক ওযরের বা অসুবিধার কারণে করেছেন। সেটা হাদীসের কিতাবে আছে। তাই একে হাদীস বলতে পারবেন। কিন্তু সেটা সুন্নাত নয়। যেমন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোমরে ব্যথা হয়েছিলো। ফলে তিনি বসতে পারতেন না। এ সময় তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস নং ২২৪) এর বিপরীতে বিভিন্ন হাদীসে তিনি বসে পেশাব করতে তাগিদ দিয়েছেন। কাজেই এ কথা বলা যাবে না যে, সহীহ বুখারী শরীফে দাঁড়িয়ে পেশাব করার হাদীস আছে, কাজেই দাঁড়িয়ে পেশাব করা সুন্নাত।

হ্যাঁ, সহীহ বুখারীতে থাকা সত্ত্বেও এটাকে সুন্নাত বলা যাবে না। কারণ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সাময়িক অসুবিধার কারণে করেছেন।

একটি হাদীস সুন্নাত হওয়ার চার নম্বর শর্ত হলোঃ জায়িযের সীমা বুঝানোর জন্য করেননি। কিছু কিছু কাজ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈধতার সীমানা বোঝানোর জন্য করেছেন। যেমন, তিনি তার এক নাতনীকে কাঁধের উপর নিয়ে নামায পড়েছেন। সে একা একাই নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধে চড়ে যেতো, আবার একা একাই নেমে যেতো। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একহাত দিয়ে সাপোর্ট দিয়েছেন। এটা সহীহ বুখারী শরীফে আছে। সহীহ বুখারীর দ্বিতীয় পারার শেষ পৃষ্ঠায় আছে। এটা হাদীস, না সুন্নাত? নিশ্চয়ই হাদীস। একজন নামাযী ব্যক্তি নামাযে কতোটুকু করলে তার নামায নষ্ট হবে না এর সীমানা বর্ণনা করার জন্য নাতনীকে কাঁধে নিয়ে তিনি নামায পড়েছেন। এটা হাদীস, কিন্তু সুন্নাত হতে পারে না। যদি সুন্নাত হতো তাহলে তো আরো অনেকবার তিনি নাতি কাঁধে নিয়ে নামায পড়াতেন। তাহলে হাদীসের ভান্ডার থেকে কোন হাদীসকে সুন্নাত বলা হবে?

উত্তর হচ্ছে-

১. হাদীসের বিধানটি উম্মতের জন্য হতে হবে।

২. হাদীসটি রহিত হয়নি।

৩. হাদীসে বর্ণিত কাজটি ওযর বা অসুবিধাবশত করেননি।

৪. জায়িযের সীমারেখা বর্ণনা করার জন্য করেননি।

এ শর্তগুলো যেসব হাদীসে পাওয়া যাবে সেগুলো হলো সুন্নাত। মোটকথা, এতক্ষণের আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণিত প্রতিটি সুন্নাতই হাদীস, কিন্তু প্রতিটি হাদীস সুন্নাত নয়। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সব নির্দেশনাতেই আমাদেরকে সুন্নাত মানতে বলেছেন। কোথাও তিনি আমাদেরকে হাদীস মানতে বলেননি। উদাহরণস্বরূপ, তিনি বলেছেন, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস নং ৪৬০৭) কী বলেছেন এখানে? সুন্নাত।

من تمسك بسنتي عند فساد امتي... এখানে কী আঁকড়ে ধরতে বলেছেন? সুন্নাত। (মু’জামুত ত্বাবারানী আওসাত; হাদীস নং ৫৪১৪)

من احيى سنة من سنتي فكأنما احياني... من أحب سنتي فقد أحبني ... এখানে কী আছে? সুন্নাত। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস নং ২৬৭৮)

لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. এখানে কী আছে? সুন্নাত। (মুআত্তা মালিক; হাদীস নং ৩৩৩৮)

تمسكم بسنتي خير من احداث بدعة. কী আছে এখানে? সুন্নাত। (মুসনাদে আহমাদ; হাদীস নং ১৬৯৭০)

من أكل طيبا وعمل بسنة ... بوائقه دخل الجنة. কী আছে এখানে? সুন্নাত। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস নং ২৫২)

অনেকগুলো হাদীস পেশ করলাম, এগুলোর সব কটিতেই সুন্নাত অনুসরণের ও আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি কোনো বানোয়াট কথা বলছি না। আহলুল হাদীস ভাইদের বলছি, দয়া করে আপনারা এমন একটা হাদীস দেখান যেখানে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে হাদীস অনুসরণ করতে বলেছেন।

হ্যাঁ, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাদীস বয়ান করো। বয়ান করে দেখো তা সুন্নাত হয় কি-না? সুন্নাত হলে মানবে। তাছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস বয়ান করতে বলেছেন, আমল করতে বলেনি। আমল করতে বলেছেন সুন্নাতের উপর। এক জায়গায় নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে সতর্ক করে বলেছেন,

يكون في اخر الزمان دجالون كذابون

অর্থঃ শেষ যামানায় বহু ধোঁকাবাজ মিথ্যুক বের হবে। যারা তোমাদেরকে হাদীস পড়ে পড়ে শুনাবে।

ما لم تسمع انتم ولا أبائك

অর্থঃ যে হাদীস তোমরাও শোননি, তোমাদের বাপ দাদারাও শোনেনি।

فإياكم وإياهم

অর্থঃ তাদের থেকে দূরে থেকো।

لا يضلونكم

অর্থঃ যাতে তারা তোমাদেরকে গোমরাহ করতে না পারে। (সহীহ মুসলিম; হাদীস নং ৭)

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে যে সতর্ক করলেন, 'ভবিষ্যতে কিছু দাজ্জাল বের হবে; যারা হাদীস বয়ান করে করে তোমাদেরকে গোমরাহ করবে'। এ হাদীসে যাদের ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন এরা কারা? এরাই-তো হাল যামানার আহলুল হাদীস।

অসংখ্য হাদীসে কাযা নামাযের বিধান বর্ণিত হয়েছে যে, তা আদায় করতে হবে। আর এরা বলছে, কাযা নামায বলে কিছু নেই। যেগুলো পিছনে কাযা হয়ে গেছে শুধু তওবা করে নিলেই না-কি মাফ পাওয়া যাবে। অথচ খন্দকের যুদ্ধে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের একসঙ্গে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে গিয়েছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো একসঙ্গে কাযা পড়ে নিয়েছেন। (সুনানে নাসাঈ; হাদীস নং ৬২২) নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কাযা পড়েছেন; আর ওরা বলছে, কাযা নামায নেই। এমন হাদীস আপনারা কোনো সময় শুনেছেন? শোনেননি। তাহলে উপরোল্লিখিত হাদীসের সাথে মিলছে কি না? ওরা আরও বলে, পুরুষ নামাযীরও বুকে হাত বাঁধতে হবে। এটা কি এর আগে কেউ শুনেছে? নতুন কথা না? তারা প্রচার করছে, একসঙ্গে তিন তালাক দিলে এক তালাক পতিত হয়। আপনারা ওদের হোটেলে গিয়ে তিন প্লেট ভাত খেয়ে এক প্লেটের দাম দিবেন। যদি জিজ্ঞেস করে তিন প্লেট খেয়ে এক প্লেটের দাম দিচ্ছেন কেনো? তখন বলবেন, একসাথে তিন তালাকে যেহেতু এক তালাক হয়, তাই তিন প্লেট খেয়ে এক প্লেটের দাম দিচ্ছি।

ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারী শরীফে ‘একসাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হবে’-শিরোনাম লিখে এর প্রমাণে পরিষ্কার দলীল বর্ণনা করেছেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস নং ৫২৫৯)

সহীহ বুখারীতে ‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর হাদীস এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে দুইহাত দিয়ে মুসাফাহা করেছেন। যথা- وكفى بين كفيه.

অর্থঃ (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেছেন) নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইহাত দিয়ে মুসাফাহা করলেন। আর আহলে হাদীসরা বলে, মুসাফাহা একহাত দিয়ে করতে হবে। (সহীহ বুখারী; হাদীস নং ৬২৬৫)

সহীহ বুখারীতে আবূ হুমাইদ আসসায়েদী থেকে হাদীস এসেছে, তিনি একদল সাহাবীকে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো নামায পড়ে দেখালেন এবং সে সময় পুরো নামাযে একবার মাত্র হাত তুললেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস নং ৮২৮)

আহলে হাদীসরা কি নামাযে একবার হাত তোলে? শুরুতে একবার, রুকূতে যাওয়ার সময় একবার, উঠার সময় একবার। তাহলে এরা সহীহ হাদীস মানলো? সহীহ বুখারী মানলো? সব-তো সহীহ বুখারীর উল্টো করছে। যা বলছিলাম, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হচ্ছে তারা এমন এমন হাদীস বলবে যা তোমরাও শোননি, তোমাদের বাপ দাদারাও শোনেনি; তাদের থেকে দূরে থাকবে। এতোক্ষনে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে যে, হাদীসে বর্ণিত সেই বিভ্রান্ত

ফিরকাই হলো বর্তমানের আহলুল হাদীস। হাদীস আর সুন্নাতের পার্থক্য বুঝে থাকলে এবার বলুন, একজন মু'মিনের জন্য কোন নামটা যুক্তিসঙ্গত; আহলুল হাদীস নাকি আহলুস সুন্নাহ? সারকথা হলো, আমরা সুন্নাত মেনে চলবো এবং সুন্নাতের উপর আমল করবো।

কোনো আহলে হাদীস সাধারণত আমার সামনে পড়ে না। অনেক আগে একজন আহলে হাদীসের দেখা পেয়েছিলাম। কথা প্রসঙ্গে তাকে বললাম, আমলের ক্ষেত্রে হাদীস যে মানতে হবে কুরআন-হাদীস থেকে আমাকে এর মাত্র একটি দলীল পেশ করুন। পক্ষান্তরে, আমাদেরকে সুন্নাত মেনে চলতে হবে এর পক্ষে আমি আপনাকে প্রচুর হাদীস দেখাবো। তিনি আমার কাছ থেকে এক সপ্তাহ সময় নিয়ে সেই যে গেলেন, দীর্ঘ ১৫ বছর হয়ে গেলো এখনও তার এক সপ্তাহ শেষ হয়নি। আসলে হাদীস মানতে হবে, এমন বর্ণনা-সম্বলিত হাদীস-তো তার কাছে নেই-ই। সুতরাং সে দেখাবে কোত্থেকে?

আমাদেরকে যেহেতু সুন্নাত মানতে হবে এজন্য আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, আমাদের মাদরাসা সমূহের পঠিত কিতাবগুলোতে শরী'আতের চার দলীলের বিবরণ এভাবে দেয়া হয়- কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, ক্বিয়াস। অর্থাৎ হাদীস না বলে সুন্নাহ বলা হয়। বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ এবং হাদীসের অন্যান্য কিতাব যারা সংকলন করেছেন তারাও তাদের কিতাবের নাম রেখেছেন সুন্নাত দ্বারা, হাদীস দ্বারা নয়। তাদের রাখা নামগুলো লক্ষ্য করুন। যেমন: সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে তিরমিযী, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ, সুনানে বাইহাকী, সুনানে দারেমী ইত্যাদি। উল্লেখ্য, 'সুনান' শব্দটি সুন্নাত-এর বহুবচন। হাদীসের কিতাবের নামকরণ করা হয়েছে সুনান দ্বারা; হাদীস দ্বারা নয়। এবার বলুন, যারা এতো বড়ো বড়ো কিতাব সংকলন করেছেন তারা কি চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই হাদীস শব্দ পরিহার করে সুন্নাত শব্দে নিজেদের কিতাবের নাম রেখেছেন? আসলে আমাদেরকে যেহেতু হাদীস মানতে বলা হয়নি; বলা হয়েছে সুন্নাত মানতে, এজন্য তারা তাদের কিতাবের নামকরণ করেছেন সুনান। তাহলে সুন্নাত এবং হাদীসের পার্থক্য আপনাদের বুঝে এসেছে? এখন বলুন, আহলে হাদীস নামটি সঠিক, নাকি আহলুস সুন্নাহ নামটি? আহলুস সুন্নাহ। যে দলের নামটাই ভুল সে দল কীভাবে সঠিক হয়? তাদের ভ্রান্তি প্রমাণের জন্য এই এক জবাবই যথেষ্ট, এক দলীলই যথেষ্ট।

ইলমের মারকায ও দারুল উলূম দেওবন্দ

বর্তমান সময়ে দুনিয়ায় 'ইলমের প্রাণকেন্দ্র হলো ভারতবর্ষ। এর আগে ছিলো রাশিয়া, তার আগে ছিলো স্পেন, তার আগে ছিলো শাম এবং মিশর, তার আগে ছিলো কূফা। আমাদের এ ভূ-খন্ডে যতো মাদরাসা দেখছেন প্রায় সবগুলোই দেওবন্দ মাদরাসার শাখা-প্রশাখা। ইংরেজরা এদেশ দখল করার পর সমস্ত

মাদরাসা বন্ধ করে দিয়েছিলো। মোঘল শাসনামলে একেকটা মাদরাসার নামে হাজার হাজার একর জমি ওয়াকফ ছিলো। ইংরেজরা সব বাজেয়াপ্ত করে হিন্দুদেরকে বণ্টন করে দিয়েছিলো। ফলে অল্প ক'দিনের মধ্যেই মাদরাসাগুলো বন্ধ হয়ে গেলো। উলামায়ে কিরাম দেখলেন, মাদরাসাগুলো বন্ধ করে দিয়ে ইসলামকে এ দেশ থেকে চিরতরে মিটিয়ে দেয়ার পাঁয়তারা চলছে। কাজেই তারা ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে ভারতের উত্তর প্রদেশের থানা শহর দেওবন্দে একটি ডালিম গাছের নিচে একজন উস্তাদ আর একজন ছাত্র দিয়ে একটি কওমী মাদরাসা চালু করলেন। উস্তাদের নাম ছিলো মোল্লা মাহমূদ, আর ছাত্রের নাম মাহমূদুল হাসান। তারা আজ থেকে ১২০/১৩০ বছর পূর্বে ডালিম গাছের নিচে মাদরাসাটি চালু করেছিলেন। এখন সেটা কয়েকশ বিঘা প্রশস্ত হয়ে গেছে। আট/দশ হাজার তালেবে 'ইলম সেখানে পড়ালেখা করছে। বর্তমানে দুনিয়ার যেখানেই সহীহ দীনের সন্ধান পাবেন খোঁজ করলে দেখবেন, এর শেকড় দেওবন্দে গিয়ে মিলেছে।

কুরআনের দা'ওয়াত পুনরায় সম্পূর্ণ সহীহরূপে ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে কার মাধ্যমে? হযরত ইলিয়াস রহ.-এর মাধ্যমে। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে তাফসীরের ছাত্র ছিলেন। বোঝা গেলো, যারা তাবলীগ মানে তাদেরকে মাদরাসাও মানতে হবে। যারা তাবলীগ মানে তাদেরকে খানকাও মানতে হবে। কারণ, হযরত ইলিয়াস রহ. মুফতী রশীদ আহমাদ গঙ্গুহীর খানকায় একবছর সময় লাগিয়েছিলেন। মুফতী রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী রহ. ঐ শতাব্দির বড়ো আলেম ছিলেন। একবার লোকেরা তার কাছে নালিশ করলো, হুযূর! ইলিয়াস-তো শুধু ঘুমায়! হযরত গঙ্গুহী রহ. বললেন, তোমরা বলছো ইলিয়াস শুধু ঘুমায়? না, সে-তো আসলে মুরাকাবা (ধ্যান) করে। মনে রেখো, ইলিয়াস একদিন পুরা দুনিয়াবাসীকে জাগিয়ে তুলবে। আজ আরবরা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় বের হচ্ছে, পুরা দুনিয়ায় 'ইলম ছড়িয়ে পড়ছে। এখন ইজতিমার ময়দানে হাজার হাজার আরব আসছে। আপনি তাবলীগ করছেন, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি অনেক বড়ো কাজ করছেন। কিন্তু খবরদার! খানকাকে অস্বীকার করবেন না, মাদরাসাকে অস্বীকার করবেন না। তাহলে গোমরাহী আপনাকে বেষ্টন করে নিবে।

যা-হোক, আলোচনা চলছিলো মাযহাব নিয়ে। মাযহাব মানার বিষয়টি পুরো দুনিয়াতেই পরিলক্ষিত হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, আরব ভূ-খন্ডে হাম্বলী মাযহাব, এশিয়ায় হানাফী মাযহাব, ইন্দোনেশিয়ায় শাফিঈ মাযহাব ইত্যাদি। আহলে হাদীসদের দাবী হলো, কুরআন-হাদীস থাকতে মাযহাব মানতে হবে কেনো? এটা আসলে ভ্রান্তপন্থীদের বিভ্রান্তিকর একটি কথা। তারা একথা বলে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চায়। তারা বলে, হাদীসের কিতাবগুলো এখন বাংলায় অনূদিত হয়ে গেছে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন তা করে দিয়েছে; তাহলে আবূ হানীফাকে মানার আর দরকার কী? তাদের এ ধরনের দৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি মানুষকে দিন দিন

দীন-ইসলাম থেকেই দূরে ঠেলে দিচ্ছে। মাযহাব ছাড়া কি কুরআন-হাদীস মানা যায়? যায় না। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন,

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ.

অর্থঃ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। (সূরা মায়িদা- ৩)

এ আয়াতটি বিদায় হজ্জে শুক্রবার দিন আরাফার ময়দানে নাযিল হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত দীন কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে। (এক) ধর্ম, (দুই) হুকুম-আহকাম। এখানে দীন বলে হুকুম-আহকাম বোঝানো হয়েছে। তাহলে আয়াতের মর্ম দাঁড়ালো, কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ দীনের উপর টিকে থাকতে যতো হুকুম-আহকামের দরকার হবে সেগুলোর সবকিছু পরিপূর্ণরূপে নাযিল করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবো, এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলোর বিধান কুরআনে পাওয়া যায় না। যেমন, ইঞ্জেকশন আধুনিককালের একটি আবিষ্কার। ইঞ্জেকশন ব্যবহারে রোযা ভাঙবে কিনা এর সমাধান আপনি কুরআনে পাবেন না। তাহলে দীনের হুকুম-আহকাম কীভাবে পরিপূর্ণ হলো? এর উত্তর হলো, আল্লাহ তা'আলা দীনের বিধি-বিধানসমূহকে দুটি পদ্ধতিতে কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন। এক. সংক্ষিপ্ত ও মূলনীতি রূপে। দুই. বিস্তারিতভাবে। যে বিধানটি বিস্তারিতভাবে এসেছে সেটা-তো আছেই, আর যে বিধানটি বিস্তারিতভাবে নেই সেটা আছে মূলনীতি রূপে। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মাদী যতো সমস্যায় পড়বে, কুরআন বিশেষজ্ঞ মুজতাহিদ ফক্বীহগণ কুরআনে বর্ণিত মূলনীতির আলোকে সেগুলোর সমাধান করে দিবেন। হাদীস বিশারদদের একটা দল যারা কুরআন হাদীসের আলোকে মাসআলা বের করতে পারে, তাদেরকে বলা হয় ফক্বীহ। সব হাদীস-বিশারদই ফক্বীহ হন না। হাদীস বিশারদ হওয়ার পাশপাশি যাদের মধ্যে কুরআন হাদীসের বর্ণনা থেকে মাসআলা-মাসাইল আবিষ্কার করার যোগ্যতা থাকে তারা হলেন ফক্বীহ। কুরআনী মূলনীতির আলোকেই তারা বলে দিবেন যে, এটা জায়েয, ওটা হারাম। এমন কোনো সমস্যা আপনি দেখাতে পারবেন না, যা কুরআনের ঐ বেসিক ল' তথা মূলনীতির দ্বারা সমাধান করা যাচ্ছে না। এখন বলুন, একজন সাধারণ মানুষ বাংলা অনুবাদ পড়ে কীভাবে মূলনীতি আর বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হবে? কীভাবে সে কুরআনের আলোকে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান খুঁজে নিবে? সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এর জন্য তাকে কুরআন-সুন্নাহয় বিশেষজ্ঞ একজন আলেমের শরণাপন্ন হতেই হবে এবং কুরআন-সুন্নাহর ব্যাপারে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই অনুসরণ করতে হবে। নতুবা তার কাছে দীন-ইসলাম আর পরিপূর্ণ মনে হবে না। এভাবে সূক্ষ্ম ও সংক্ষিপ্ত বিষয়াবলীতে একজন নির্ভরযোগ্য ও বিশেষজ্ঞ আলেমের ব্যাখ্যা মেনে দীন পালনের নামই হলো মাযহাব মানা, যার কোনো বিকল্প নেই।

সূরা মায়িদার ৩নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। আর সূরা নিসার ৫৯নং আয়াতে পরিপূর্ণ করে দেয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যথা, أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ এ আয়াতের তাফসীরে উলামায়ে কিরাম বলেছেন, (এক) أَطِيعُوا اللَّهَ দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন, (দুই) أَطِيعُوا الرَّسُولَ দ্বারা উদ্দেশ্য সুন্নাত, (তিন) أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য ইজমা।

চার ইমাম ও মুহাদ্দিসের সময়কাল এবং ফক্বীহ ও মুহাদ্দিসের পরিচয়

বর্তমানে সারা দুনিয়ায় যে চারটি মাযহাব চালু আছে। এ চার মাযহাবের ইমামগণ সময় ও কালের বিচারে হাদীস সংকলনকারীদের অগ্রজ। আমাদের ইমাম আবূ হানীফা রহ. এ কাফেলার সবার অগ্রজ ছিলেন। তিনি কমপক্ষে দশজন সাহাবীকে স্বচক্ষে দেখেছেন। (আল-খায়্যিরাতুল হিসান; পৃষ্ঠা ৩৫) তিনি আর ইমাম মালেক রহ. একই যুগের মানুষ। তবে ইমাম আবূ হানীফা রহ. যখন বয়োবৃদ্ধ, ইমাম মালেক রহ. তখন যুবক। ইমাম আবূ হানীফা রহ. হজ্জ বা উমরার সফরে মদীনায় গিয়ে ইমাম মালেক রহ.-এর বাড়িতে মেহমান হতেন। কিতাবে আছে, ইমাম মালেক রহ.-এর বাড়িতে মেহমান থাকাকালীন তিনি রাতে ঘুমাতেন না। সারা রাত ইমাম মালেক রহ.-এর ফিক্বহ-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর সমাধান দিতেন। এজন্যই তাদের দুই মাযহাবের মধ্যে তেমন কোনো মতপার্থক্য নেই।

ইমাম শাফিঈ রহ. আমাদের ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর প্রধান দুই শাগরেদ ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর শাগরেদ। অর্থাৎ ইমাম শাফিঈ রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নাতি পর্যায়ের শাগরেদ। আর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. তার নাতির পূত্র পর্যায়ের শাগরেদ। ইমাম আবূ হানীফা রহ. যেদিন মৃত্যুবরণ করেন সেদিন ইমাম শাফিঈ রহ. দুনিয়ায় আগমন করেছেন। তাই তিনি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে জীবদ্দশায় পাননি। আর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. হলেন ইমাম শাফিঈ রহ.-এর ছাত্র।

মুহাদ্দিসীনে কিরামের একটি দল কুরআন-সুন্নাহ হতে মাসআলা-মাসাইল আহরণ ও উদ্ভাবন করতে পারেন। তাদেরকে মুজতাহিদ ইমাম বলা হয়। আমাদের ইমাম সাহেবের প্রধান ছাত্র হলেন আবূ ইউসুফ রহ.। তিনি আবূ হানীফা রহ.-এর কাছে ফিক্বহ শিখতেন, আর সুলাইমান ইবনে মেহরানের কাছে হাদীস শিখতেন। একবার সুলাইমান ইবনে মেহরানের দরবারে একব্যক্তি মাসআলা জানতে আসলো। তিনি অপারগতা প্রকাশ করে আবূ ইউসুফ রহ.-কে এর উত্তর দিতে বললেন। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. তৎক্ষণাৎ সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন। সুলাইমান ইবনে মেহরান বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি কীভাবে বললে? তিনি বললেন, হুযূর! গতকাল আপনি যে হাদীসটি পড়িয়েছেন তার মধ্যেই-তো এ মাসআলা আছে। তখন সুলাইমান ইবনে মেহরান খুশি হয়ে বললেন, يا معشر

الفقهاء انتم الاتباء ونحن الصيادلة (অর্থ) হে ফক্বীহবৃন্দ! তোমরা হলে ডাক্তার, আর আমরা কেবল ওষুধ বিক্রেতা। (কিতাবুস সিকাত [ইবনে হিশাম] তরজমা নং ১৪৪৬৫, নসীহাতু আহলুল হাদীস [খতীবে বাগদাদী] ১/৪৫) এ ঘটনা থেকে বোঝা গেলো, কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিস হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শিতার পাশাপাশি হাদীস থেকে মাসআলাও আহরণ করতে পারেন।

ইয়াযীদ ইবনে হারুন রহ. ইমাম বুখারী রহ.-এর উস্তাদ ছিলেন। একবার তিনি কোনো এক মাজলিসে বসা ছিলেন। তার সামনে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, যুহাইল ইবনে হারুন প্রমুখ বড়ো বড়ো ব্যক্তিবর্গ বসেছিলেন। এমন সময় একব্যক্তি মাসআলা জিজ্ঞেস করতে আসলো। উপস্থিতিদের সকলের বড়ো ছিলেন ইয়াযীদ ইবনে হারুন রহ.। তিনি ঐ ব্যক্তিকে বললেন, মাসআলা জিজ্ঞেস করতে এখানে এসেছো কেনো? কোনো আহলুল ‘ইলমের কাছে যাও! আমরাতো আহলুল হাদীস। ঐ ব্যক্তি চলে গেলে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বললেন, আমরা এ যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হিসেবে পরিচিত; তবুও আমরা কি আহলুল ‘ইলম নই? ইয়াযীদ ইবনে হারুন বললেন, না। তোমরা আহলুল ‘ইলম নও! এরপর বললেন,

أنتم أهل الحديث وأهل العلم تلاميذ أبي حنيفة.

অর্থাৎ তোমরা হলে আহলুল হাদীস। আহলুল ‘ইলম হলো আবূ হানীফার ছাত্রবৃন্দ। কাজেই ফাতাওয়া তারাই দিবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সূরা নিসার ৫৯নং আয়াতের, أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ দ্বারা ইজমা উদ্দেশ্য। নতুন কোনো বিষয় জায়েয-নাকি নাজায়েয তা বের করতে গিয়ে ফক্বীহগণ যদি কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একমত হন তাহলে তাকে ইজমা বলে। যেমন, ‘কোনো একটা জিনিস নিজের আয়ত্বে নেয়ার পূর্বে তা বিক্রি করা নিষেধ’- এ ব্যাপারে ইমাম চতুষ্টয়ের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। অথচ বর্তমানে জাহাজ সাগরে থাকা অবস্থায় মালামাল আমদানীকারকের আয়ত্বে আসার পূর্বেই তা বেচা-বিক্রি শুরু হয়ে যায়- যা নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভিন্নতা নেই।

ইজমা যে শরী‘আতের দলীল তা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। সূরা নিসার ১১৫নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যে ইজমার বিরুদ্ধাচরণ করবে তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। এ আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করার জন্য ইমাম শাফিঈ রহ. চার চার বার কুরআনুল কারীম খতম করেছেন। কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও আহলে হাদীসরা ইজমা অস্বীকার করছে।

এরপর আছে فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ অর্থাৎ যদি কোনো মাসআলার সমাধানের ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দেয় তাহলে তার সমাধান ক্বিয়াসের মাধ্যমে হবে। কুরআনে আরো আছে, فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ। (সূরা হাশর; আয়াত ২) তাফসীরের

কিতাবগুলোতে এর দ্বারাও ক্বিয়াস উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা দ্বারাও ক্বিয়াস প্রমাণিত। যেমন, ইয়ামান বিজিত হলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু‘আয ইবনে জাবাল রাযি.-কে সেখানকার গভর্ণর নিযুক্ত করলেন। তিনি ছিলেন আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ফক্বীহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, লোকজন যখন তোমার কাছে মাসআলা জানতে আসবে তখন তুমি কীভাবে ফয়সালা দিবে? মু‘আয ইবনে জাবাল রাযি. বললেন, কুরআন দ্বারা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কুরআনে না পেলে? তিনি উত্তর দিলেন, সুন্নাত দ্বারা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেখানে না পেলে? (যেহেতু নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় ইজমার প্রশ্নই আসে না, এজন্য) তিনি বললেন, সুন্নাতে না পেলে ক্বিয়াস করবো। অর্থাৎ সমস্যাটিকে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত অনুরূপ কোনো বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে সমাধান বের করবো। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস নং ৩৫৯৪, নবাব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব আর রওযাতুন নাদাবিয়্যাহ কিতাবে এ হাদীসকে মাশহুর বলেছেন)

মোটকথা, সূরা মায়িদায় আল্লাহ তা‘আলা বললেন, আজকে বিধি-বিধান পূর্ণ করলাম। আর সূরা নিসায় তার ব্যাখ্যায় বললেন, বিধি-বিধান পূর্ণ করলাম চার জিনিস দ্বারা। (এক) কুরআন, (দুই) সুন্নাত, (তিন) ইজমা এবং (চার) ক্বিয়াস। এগুলোর মধ্যে আহলে হাদীসরা একটাও মানে না। কারণ ইজমা-ক্বিয়াস কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, কিন্তু তারা তা মানে না। কাজেই কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিষয়াদি না মানলে কুরআন-হাদীস মানলো কী করে? আলহামদুলিল্লাহ! আমরা চার মাযহাবও মানি, চারটি দলীলও মানি। ইজমা-ক্বিয়াস তথা মাযহাব মানার কারণে তারা আমাদেরকে বলে বেঈমান। আমরা কুরআন পুরা মানা সত্ত্বেও বেঈমান হয়ে গেলাম! তাহলে যারা কোনোটিই পরিপূর্ণ মানে না তাদের ঈমানের কী অবস্থা?!

আহলে হাদীসের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন

আহলে হাদীসের কাছে আমি কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করছি, পারলে তারা ক্বিয়াস করা ছাড়া সরাসরি কুরআন-হাদীস দ্বারা এগুলোর উত্তর দিক।

উড়ন্ত বিমানে নামায পড়া যাবে কি-না? ইঞ্জেকশন নিলে রোযা ভাঙবে কি-না? শেয়ার ব্যবসা জায়েয আছে কিনা? এগুলোর উত্তর যেহেতু সরাসরি কুরআন-হাদীসে নেই, এজন্য ক্বিয়াস করা ছাড়া তারা এর উত্তর দিতে পারবে না। ডেসটিনি-২০০০ লি. জায়েয না হারাম? এর সমাধান কোন আয়াতে আছে তারা তা বলতে পারবে না। কেননা ডেসটিনির কথা-তো কুরআনে নেই। এ জাতীয় হাজারো মাসআলা আছে যার বিবরণ কুরআন-হাদীসে সরাসরি নেই। অনুরূপভাবে, ক্যামেরা দ্বারা ছবি তোলাসহ নিত্যনতুন হাজারো জিনিস আবিষ্কার

হচ্ছে, যেগুলোর বিবরণ কুরআন-হাদীসের কোথাও নেই। তারা এগুলো ব্যবহারের বৈধতা-অবৈধতা সম্পর্কে জনগণকে কীভাবে অবহিত করবে? যদি তারা তা না পারে তাহলে আল্লাহ তা'আলার বাণী-আজ আমি ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিলাম-বক্তব্যের বাস্তবতা কী রইলো? দীন কীভাবে পূর্ণ হলো? এভাবে তারা এ উভয় আয়াতকে অস্বীকার করলো।

মাযহাব একাধিক হওয়ার কারণ

অনেকে প্রশ্ন করে- আমাদের ধর্ম এক, নবী এক তাহলে মাযহাব চারটি হবে কেনো? আসলে মাযহাবের ভিন্নতা আল্লাহ তা'আলার এক অপার অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। এটা তার মর্জি অনুযায়ীই হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন মানুষের চলার পথ সহজ হোক। এজন্য তিনি তার যোগ্য বান্দাদের দ্বারা মাযহাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। চার মাযহাবকে জান্নাতে যাওয়ার চারটি পথের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ফলে যে কেউ যে পথ ধরেই এগোতে থাকুক অবশেষে জান্নাতেই প্রবেশ করবে। চার মাযহাবের তিন মাযহাবেই উরু ঢেকে রাখা ফরয। কিন্তু মালেকী মাযহাবে ফরয নয়, মুস্তাহাব। প্রত্যেক মাযহাবের পক্ষেই হাদীসের রেফারেন্স আছে। এ মতপার্থক্যের ফায়দা হলো : যারা মাঠে-ময়দানে, ক্ষেত-খামারে কাজ করে অনেক সময় তারা খেয়ালে-বেখেয়ালে হাঁটুর উপর কাপড় গুটিয়ে কাজ করে। ইমাম মালেক রহ.-এর মাযহাবের দিকে তাকালে তাদেরও মাফ পাওয়ার একটা উপায় লক্ষ্য করা যায়।

মোটকথা, মাযহাব আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী হয়েছে। আমাদের একথা বলার যথার্থ কারণও রয়েছে। লক্ষ্য করুন, কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ২২৮নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

অর্থঃ তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিন 'কুরু' পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। আপনি যেকোনো আরবী অভিধান খুলে দেখুন, সেখানে 'কুরু' শব্দের দু'টি অর্থ লেখা আছে। (এক) পবিত্রতা, (দুই) হায়েয। কুরআনে কারীমে 'কুরু' শব্দটি উক্ত দুটি অর্থের কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। তাদের কারও কারও মতে, কুরআনে 'কুরু' শব্দটি 'পবিত্রতা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর কারও কারও মতে, 'হায়েয' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের এ মতপার্থক্যের কারণে পরবর্তীতে ইমামদের মধ্যেও মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। হানাফীরা বলেন, যে সকল সাহাবী 'কুরু' দ্বারা 'হায়েয' উদ্দেশ্য নিয়েছেন আমরা তাদের সঙ্গে একমত। আর শাফিঈরা বলেন, আমরা 'পবিত্রতা' অর্থ গ্রহণকারী সাহাবীদের সঙ্গে একমত। অতএব, দেখা যাচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর যে সকল বক্তব্য একাধিক অর্থের ধারক এবং অর্থগুলোও বিপরীতধর্মী অর্থাৎ দুটোকে একই সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়, অথচ আমল

করার স্বার্থে দুটোর একটাকে গ্রহণ করতেই হবে-সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে, যারা সকলেই ছিলেন নির্দ্বিধায় অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আর সেই মতপার্থক্যের সূত্র ধরেই পরবর্তীতে মাযহাবের ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। আর এটা কেনোই বা হবে না, মাযহাবের ইমামগণ-তো ছিলেন দীন সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মাযহাব তথা মতামতসমূহের সংকলক; নতুন মতের স্রষ্টা নন। আপনি মাযহাবের ইমামগণের মতপার্থক্য নিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখুন, যেকোনো মাসআলায় তারা যখন কোনো মতামত ব্যক্ত করেছেন, তখন এর পেছনে অবশ্যই কোনো না কোনো সাহাবীর মতামত উৎস হিসেবে কাজ করেছে। তবে বক্তব্য ও কিতাব সংক্ষেপ করার সুবিধার্থে সাধারণত সে সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয় না। এখন লক্ষ্য করুন, আমাদের আলোচ্য মাসআলায় এই যে সাহাবায়ে কিরামের মতপার্থক্য এবং ইমামদের ইখতিলাফ-এর ভিত্তি হলো, আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত দ্ব্যর্থবোধক 'কুরু' শব্দটি। এখন বলুন, আল্লাহ তা'আলা কি জানতেন না যে, 'কুরু' শব্দটি দুটি অর্থের ধারক হওয়ায় উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ণয়ে তার নবীর সাহাবীগণের মধ্যে মতবিরোধ হবে এবং পরবর্তীতে উম্মতের মধ্যেও এ ইখতিলাফ সঞ্চারিত হবে? এ ইখতিলাফ যদি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী না হতো তাহলে তিনি কি 'কুরু' না বলে স্পষ্টভাবে 'হায়েয' বা 'পবিত্রতা' উল্লেখ করতে পারতেন না? অবশ্যই পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে বিপরীতমুখী দুটি অর্থের ধারক 'কুরু' শব্দটিই ব্যবহার করলেন। এতে বোঝা গেলো, মাযহাব তথা, যোগ্যলোকের মতপার্থক্য আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ীই হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও মাযহাবের প্রতি ইঙ্গিত ও মর্জি ছিলো। যেমন : রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের একটি জামা'আতকে বনু কুরাইযার বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে পাঠালেন। রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি তাদেরকে বলে দিলেন, তোমরা বনু কুরাইযায় পৌঁছে আসরের নামায আদায় করবে। এটা বুখারী শরীফের ৪১১৯ নং হাদীস। সাহাবায়ে কিরাম বনু কুরাইযায় পৌঁছার আগেই আসরের সময় হয়ে গেলো। এবার সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে দুটি মাযহাব হয়ে গেলো। কেউ কেউ বললেন, নামায কাযা হলেও আমরা সেখানে গিয়েই নামায আদায় করবো। কারণ, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অমান্য করা যাবে না। তারা সফর অব্যাহত রাখলেন। আর কতক সাহাবা ছিলেন ফক্বীহ ধরনের। তারা বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথা বলার উদ্দেশ্য ছিলো আমাদের দ্রুতগতিতে গন্তব্যে পৌঁছা। যেহেতু আমরা আসরের পূর্বে সেখানে পৌঁছতে পারলাম না, কাজেই নামায কাযা করা যাবে না। অতঃপর তারা পথেই আসরের নামায আদায় করে নিলেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে তারা ঘটনাটি নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়

মাযহাব তথা মতামতকে সমর্থন করলেন; কাউকেই তিরস্কার করলেন না। তাহলে দেখা গেলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে মাযহাবের ইচ্ছা করেছেন। অন্যথায় তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলে দিতে পারতেন যে, কাযা হোক আর যাই হোক বনু কুরাইযায় পৌঁছেই তোমরা আসর পড়বে। স্পষ্টতঃ তিনি উভয় মাযহাবকেই সমর্থন করলেন। সম্ভবত মাযহাবের ভিন্নতার ফলে উম্মতের জন্য দীন পালন করা সহজ হবে ভেবেই তিনি এমনটি করেছেন। (আল্লাহ তা‘আলাই ভালো জানেন)

আরও দেখুন, নতুন কোনো এলাকা বিজিত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন একজন সাহাবীকে সেখানে গভর্নর করে পাঠাতেন এবং তাদেরকে বলে দিতেন যে, সেখানকার লোকেরা দীনের ব্যাপারে তোমাকেই মুরুব্বী মানবে, তাদের আর মাসআলা-মাসাইল জানার জন্য মদীনায় আসা লাগবে না। মু‘আয ইবনে জাবাল, হাকীম ইবনে হিযাম রাযি. প্রমুখ সম্পর্কে বর্ণিত ঘটনাগুলো এর প্রমাণ। বলাবাহুল্য, এভাবেই কোনো সাহাবীকে যে অঞ্চলে পাঠানো হতো সে অঞ্চলে তার মাযহাব কায়েম হয়ে যেতো। এর সরল অর্থ এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতোজন ব্যক্তিকে গভর্নর বানিয়েছিলেন প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব ছিলো। চার খলীফার ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব ছিলো। আবূ বকর রাযি.-এর মাযহাব হলো, তারাবীহর নামায বাড়িতে পড়বে। আর উমর রাযি.-এর মাযহাব হলো, সকলেই মসজিদে এক ইমামের পিছনে তারাবীহর নামায পড়বে। তবে কেউ বাড়িতে পড়লে তার উপর আপত্তি করারও দরকার নেই। এ সকল মতভিন্নতা সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেই বিদ্যমান ছিলো। পরবর্তীকালে বড়ো বড়ো উলামায়ে কিরাম নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী মাসআলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের এসব মতভিন্নতার দলীলভিত্তিক পর্যালোচনা করেছেন এবং একাধিক মতের একটিকে প্রাধান্য দিয়ে সেগুলো কিতাব আকারে একত্রিত করেছেন। ফলে বিভিন্ন মাযহাব সুবিন্যস্ত আকারে উম্মতের সামনে চলে এসেছে এবং একেক ইমামের সংকলিত মতামতগুলো ঐ ইমামের মাযহাব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

মাযহাব চার সংখ্যায় সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ

শুরুতে মাযহাব চারটিতে সীমাবদ্ধ ছিলো না। তখন যেহেতু ইজতিহাদে পারদর্শী ইমামের সংখ্যা অনেক ছিলো, তাই মাযহাবের সংখ্যাও ছিলো অনেক। আমরা এখন শুধু চার ইমামের চার মাযহাবের কথা জানি। অন্যান্যদের নাম অনেকেই জানি না। যেমন : ইবনে শুবরুমার মাযহাব, ইবনে আবী লায়লার মাযহাব। অনুরূপভাবে, ইমাম আওযায়ী, ইমাম সুফিয়ান সাওরী এরা প্রত্যেকেই মাযহাবের ইমাম ছিলেন। তৎকালে তাদের মাযহাবও লোকেরা অনুসরণ করতো। তাহলে পরবর্তীতে চারটিতে কীভাবে সীমাবদ্ধ হলো? বস্তুত এটা আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছাতেই হয়েছে। তবে এর বাহ্যিক কারণ হলো, প্রসিদ্ধ চার ইমাম ছাড়া অন্যদের

মাযহাব সংকলনে যে সকল কিতাব লেখা হয়েছে তাতে দীনী সকল বিষয়ের সব সমস্যার সমাধান বিবৃত হয়নি। কিন্তু চার ইমামের কিতাবে প্রায় সব সমস্যার সমাধান সংকলিত হয়েছে। স্বভাবতই, মানুষ যেখানে একসঙ্গে তার সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছে, দীন পালনের জন্য সেদিকেই ঝুঁকে পড়েছে। অবশেষে মানুষের এ ঝোঁক চার মাযহাবে সীমিত হয়ে গেছে।

চার মাযহাবই হক্ব, আমরা কোনটা মানবো?

উম্মতের সর্বজনমান্য ব্যক্তিবর্গ এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যদি কেউ ইসলাম অনুযায়ী চলতে চায় তাহলে চার ইমামের কোনো একজনের সংকলিত মাযহাব অনুসরণ করতে হবে; মনমতো একেক মাসআলায় একেক ইমামের মাযহাব অনুসরণ করা যাবে না। আমাদের এ বক্তব্য হাদীসের আলোকেও প্রমাণিত। কোনো দেশে ব্যাপকভাবে যে মাযহাবের মুফতী পাওয়া যায় সে দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিকে সে মাযহাব অনুসরণ করতে হবে। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে হানাফী মাযহাবের মুফতী পাওয়া যায়, তাই আমাদেরকে হানাফী মাযহাবই মানতে হবে। অন্যকোনো মাযহাব মানা যাবে না। ইন্দোনেশিয়ার অধিকাংশ মুফতী শাফিঈ মাযহাবের, তাই সেখানে শাফিঈ মাযহাব; আর তিউনিসিয়া, মৌরিতানিয়ায় মালেকী মাযহাবের মুফতীগণ সংখ্যায় অধিক, কাজেই সেখানে মালেকী মাযহাব মানতে হবে।

ইমাম ‘আব্দুল ওয়াহহাব রহ. শাফিঈ মাযহাবের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বড়ো আলেম ছিলেন। তিনি বলেন, একবার মুকাশাফার মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা আমাকে হাশরের ময়দান দর্শন করিয়েছেন। আমি দেখলাম, হাউযে কাউসারের সবচেয়ে কাছে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর গম্বুজ। এর কিছুটা দূরে ইমাম মালেক রহ.-এর গম্বুজ। তার কিছুটা দূরে ইমাম শাফিঈ রহ.-এর গম্বুজ। তার কিছুটা দূরে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর গম্বুজ। এ ঘটনা ইমাম ‘আব্দুল ওয়াহহাব রহ.-এর কিতাবেও আছে। (মীযানুল কুবরা [ইমাম শা’রানী] ১/৬৬) শাইখ যাকারিয়া রহ.-এর কিতাব শরী‘আত আওর তরীকত কা তালাযুম-এর মধ্যেও এ ঘটনা লিখা আছে। এ মুকাশাফার পর-তো ‘আব্দুল ওয়াহহাব রহ.-এর শাফিঈ মাযহাব ছেড়ে হানাফী মাযহাবে চলে আসার কথা ছিলো। কিন্তু তিনি মাযহাব পরিবর্তন করেননি, করতে পারেননি। কারণ তিনি যে এলাকায় থাকতেন সেখানে সকলেই শাফিঈ ছিলো।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. আমরা হাদীস পড়াতে গিয়ে যার সনদ বর্ণনা করি, তিনি কুতুবে সিত্তাহর কিতাব পড়েছেন মক্কা-মদীনায়। তার সকল উস্তাদ শাফিঈ এবং মালেকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি বলেন, আমার সকল উস্তাদ যেহেতু মালেকী এবং শাফিঈ, তাই আমার মন চাইতো আমি এ দুই মাযহাবের কোনো একটি অনুসরণ করি। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা আমাকে ইলহাম

করে বলে দিয়েছেন, হে ওয়ালীউল্লাহ! তুমি যেহেতু হিন্দুস্তানে বসবাস করছো এবং এখানকার লোকেরা বহুকাল পূর্ব থেকে হানাফী মাযহাব মেনে আসছে, কাজেই তুমিও হানাফী মাযহাব অনুসরণ করো। তাহলে বোঝা গেলো, মাযহাব আল্লাহ তা'আলার ইশারায় হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইঙ্গিতে হয়েছে।

ফিক্বহ আর সুন্নাত অভিন্ন অর্থের ধারক। সুতরাং ফিক্বহও মানতে হবে। এক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

رب حامل فقه غير فقيه.

অর্থাৎ অনেক মুহাদ্দিস এমনও আছেন যারা ফক্বীহ নয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস নং ২৩০) তারা যদি হাদীসের শব্দগুলো সঠিকভাবে উম্মতকে পৌঁছে দেয় তাহলে সেটাও দীনের অনেক বড়ো খিদমত হবে। কারণ হাদীসটি কোনো ফক্বীহর কাছে পৌঁছলে তিনি এর আলোকে অসংখ্য মাসআলা বের করতে সক্ষম হবেন।

মুহাদ্দিসীনে কিরাম যারা বড়ো বড়ো হাদীসের কিতাব সংকলন করেছেন তারা সকলেই মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কুতুবে সিত্তাহর সকল লেখক মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইমাম বুখারী রহ. শাফিঈ মাযহাবের ছিলেন। কারণ তার পিতৃপুরুষগণ পূর্ব থেকেই শাফিঈ মাযহাবের ছিলেন। বড়ো বড়ো তাফসীর গন্থের লেখকগণও মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ফিক্বহের সকল কিতাব মাযহাবের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। হিদায়া কিতাব হানাফী মাযহাবের উপর লেখা, শাফিঈ মাযহাবের কিতাব কিতাবুল উম্ম, মালেকী মাযহাবের কিতাব আল মুদাউওয়ানাতুল কুবরা, হাম্বলী মাযহাবের কিতাব আল মুগনী।

মোটকথা হাদীস, ফিক্বহ, তাফসীর সকল কিতাবের লেখক মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এমনকি যে শাস্ত্রের মাধ্যমে হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা হয় সেই উলূমুল হাদীসের সকল লেখকও মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। যেমন : ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. শাফিঈ মাযহাবের ছিলেন।

হাদীস-উলূমুল হাদীস, তাফসীর-উসুলে তাফসীর, ফিক্বহ-উসুলে ফিক্বহসহ দীনের মৌলিক কোনো শাস্ত্রে বর্তমানের নামধারী আহলে হাদীসদের লেখা কোনো প্রামাণ্য কিতাব নেই। এসব শাস্ত্রের সকল প্রামাণ্য কিতাব মাযহাবী উলামায়ে কিরামের লেখা। তাদের যদি জানা থাকে তবে তারা দেখাক যে, অমুক প্রামাণ্য কিতাবটি তাদের কোনো পন্ডিতের লেখা। কিন্তু তারা এরূপ কোনো কিতাব দেখাতে পারবে না। যারা হাদীস সংকলন করেছেন তারা সকলেই মাযহাবী আলেম ছিলেন। আহলে হাদীসের ফাতাওয়া অনুযায়ী তারা মুশরিক। আমাদের প্রশ্ন হলো, মুহাদ্দিসীনে কিরামকে মুশরিক ফাতাওয়া দিয়ে কোন মুখে মুশরিকের কিতাব দিয়েই তারা দলীল দেয়? আশ্চর্যের কথা! তাফসীর-ওয়ালারা মুশরিক, উসূলে হাদীস-ওয়ালারা মুশরিক, সকল ফিক্বহের লেখক মুশরিক! তাহলে তাদের

কিতাব পড়ো কেনো? তোমাদের জন্য তাদের কিতাব দ্বারা হাদীস যাচাই করা জায়েয আছে? কোনো হিন্দু যদি ইসলাম সম্পর্কে কিতাব লেখে তাহলে তার কিতাব দ্বারা কি দলীল দেয়া জায়েয হবে?

মাযহাব মানার একটা বড়ো ফায়দা হলো, সুন্নাত তরীকায় পূর্ণ শরী'আতের উপর আমল হয়ে যায়। নামাযে তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত কতোটুকু উঠাবে এ ব্যাপারে দু' রকম হাদীস আছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে কান পর্যন্ত উঠাবে, আর অন্যটায় আছে কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। দুটোই সুন্নাত এবং দুটোই আমলযোগ্য হাদীস। তাহলে তারা কোনটা মানবে? তারা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠায়। ফলে মাত্র একটি হাদীসের উপর আমল করে। আর আমাদের ইমাম সাহেব বলেছেন, পুরুষরা হাত কান পর্যন্ত উঠাবে। এতে কান পর্যন্ত হাত উঠানোর হাদীসের উপর আমল হয়ে যাবে। আর মহিলারা কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে এতে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানোর হাদীসের উপরও আমল হয়ে যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মাযহাব মানার ফলে আমরা দুটি হাদীসের উপরই আমল করতে পারছি। আর তারা হাদীস মানার দাবীদার হয়ে একটির উপর আমল করছে। সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে আছে, لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. অর্থঃ ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না। (সহীহ মুসলিম; হাদীস নং ৩৯৪)

আবার ত্বহাবী শরীফ ও মুআত্তা ইমাম মালিকে আরেকটা হাদীস আছে,

من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.

অর্থঃ যার ইমাম আছে তার জন্য ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস নং ৮৫০)

আমরা মাযহাব মানি। এজন্য আমরা বলি, এ দুটোর প্রথম হাদীসটি ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য; মুকতাদীর জন্য নয়। আর দ্বিতীয় হাদীসটি মুকতাদীর জন্য।

তারা বলে, সূরা ফাতিহা না পড়লে ইমামের পিছনে মুকতাদীর নামায হবে না। তাহলে তাদেরকে প্রশ্ন করুন, তাদের কোনো ব্যক্তি যদি এমন সময় মসজিদে উপস্থিত হয় যখন ইমাম সাহেব রুকূতে চলে গেছেন, তখন সে কী করবে? সে কি ইমামের সঙ্গে নামাযে শরীক হয়ে যাবে, নাকি সূরা ফাতিহা পড়বে? যদি সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায না হয়, তাহলে ফাতিহা না পড়ে রুকূতে গেলে-তো তার নামায হবে না। আর যদি এখন শরীকও হতে চায়, আবার সূরা ফাতিহাও পড়তে চায় তাহলে সেটা রুকূর মধ্যে পড়তে হবে। অথচ হাদীসে রুকূ ও সিজদায় কিরাআত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। (সহীহ মুসলিম; হাদীস নং ৪৭৯) তাদের মতানুসারে, উক্ত ব্যক্তি যদি নামাযে শরীক হয় তাহলে তার এ রাকা'আত গৃহীত হবে না। তবে কি উক্ত ব্যক্তি এ রাকা'আতে শরীক না হয়ে পরের রাকা'আতে শরীক হবে? না, সে সেটাও পারবে না। কারণ নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ ইমামকে নামাযের যেখানে পাবে সেখানেই তার সঙ্গে শরীক হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি রুকূ পাবে সে রাকা‘আত পেয়ে যাবে। আর যে রুকু পাবে না সে রাকা‘আত পাবে না। (মুসনাদে আহমাদ; হাদীস নং ৭২৩০, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস নং ৮৯৩) মাযহাব মানলে এ জাতীয় কোনো সমস্যাই নেই। কেননা আমাদের ইমাম সাহেব সব হাদীসের প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেছেন, উক্ত ব্যক্তি যেহেতু মুকতাদী, তাই ইমামের ফাতিহাই তার ফাতিহা বলে গণ্য হবে। তাকে আর একাকী ফাতিহা পড়তে হবে না। সে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মুতাবিক ইমামের সঙ্গে নামাযে শরীক হয়ে যাবে এবং রুকূ পেয়েছে বিধায় রাকা‘আতটিও পেয়ে যাবে।

তারা আমীন জোরে বলে, না আস্তে বলে? জোরে বলে। তাহলে শুনুন, হযরত মু‘আয ইবনে জাবাল রাযি. তখন ইয়ামানের গভর্নর। একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তার হাতে মুসলমান হলেন। তার নাম ছিল ওয়াইল ইবনে হুজর। মু‘আয ইবনে জাবাল রাযি. তাকে বললেন, তুমি-তো অনেক বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যাও। তোমার দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা অনেক কাজ নিবেন। হযরত মু‘আয রাযি.-এর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে মদীনায় গেলেন। তিনি সেখানে বিশ দিন অবস্থান করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি যা করি তুমি তা দেখো। তিনি সেখানে ৪০ ওয়াক্ত নামায আস্তে কিরাআতে পড়লেন। অর্থাৎ ২০ দিনের যুহর-আসর। আর ৬০ ওয়াক্ত নামায জোরে কিরাআতে, অর্থাৎ মাগরিব, ইশা ও ফজর পড়লেন। এতোগুলো নামাযের মধ্যে ৫৭ ওয়াক্ত নামাযে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন শব্দটি আস্তে বললেন, আর মাত্র তিন ওয়াক্ত নামাযে জোরে বললেন। তখন ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. বুঝলেন, আমীন আস্তে বলাই মূল-নিয়ম। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক ওয়াক্তে জোরে বলেছেন, আমীন কোথায় বলতে হবে তা শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে। সুতরাং শিখানোর জন্য অর্থাৎ কোনো নওমুসলিম যদি পিছনে থাকে তবে এক দুই ওয়াক্ত ‘আমীন’ জোরে বলা যেতে পারে।

এ দু’ তিনটি উদাহরণ দ্বারা আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, মাযহাব মানলে সকল হাদীসের উপরই আমল হয়ে যায়। আর নিজে নিজে পন্ডিত সাজলে একটা ধরলে দশটা হাতছাড়া হয়ে যায়। সারকথা হলো, মানুষের মধ্যে বিবেক-বিবেচনা বলে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে হেদায়াতের জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট। আর কেউ যদি জিদ করে বসে যে, যতো সত্যই কেউ আমার সামনে পেশ করুক আমি-তো ভ্রান্তির উপর অটল থাকবোই; তাহলে তার হিদায়াত পাওয়ার পন্থা আমাদের জানা নেই।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলকে হক্কানী উলামায়ে কিরামের সান্নিধ্যে থেকে সঠিক পথের উপর কায়েম ও দায়েম থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বয়ান-৩

মার্চ ২০১৪ খ্রি.। মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত ‘লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে কিরামের করণীয়’ শীর্ষক পাঁচদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত হযরতুল আল্লাম মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা. এর মূল্যবান বয়ান।

بعد الحمد والصلاة. قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلي الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون. يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وقال النبي صلي الله عليه وسلم: رب حامل فقه غير فقيه. أوكما قال النبي صلي الله عليه وسلم.

ভূমিকা

মুহতারামুল মাকাম, উস্তাযুল কুল, বাংলাদেশের উলামায়ে কিরামের মুরুব্বী, আমারও খাছ মুরুব্বী, ফক্বীহুল মিল্লাত হযরত মুফতী ‘আব্দুর রহমান সাহেব দা.বা. এবং উপস্থিত অন্যান্য উলামায়ে কিরাম!

আল্লাহর খাছ মেহেরবাণী যে, দ্বীনের হিফাযতের দায়িত্ব তিনি নিজে নিয়ে সমগ্র মানব জাতির হিদায়াতের জন্য কুরআন নাযিল করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এর প্রত্যেকটি শব্দ, অর্থ ও এর উপর আমলসহ সবকিছুর হিফাযতের দায়িত্বও তিনি নিয়েছেন। যার প্রকৃত অর্থ এই যে, যখনই কোনোদিক থেকে দ্বীনের উপর আক্রমণ আসবে, তখনই আল্লাহ তা‘আলা তার খাছ বান্দাদের মধ্য হতে কিছু বান্দাকে দাঁড় করিয়ে দিবেন। আর তারা আক্রমণকারী বাতিলের মুকাবিলা করে বাতিলকে খতম করে দিবে। আল্লাহ তা‘আলার বাণী- ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض আল্লাহ তা‘আলা যদি মানবজাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন (সূরা বাকারা; আয়াত ২৫১)-এর মধ্যে بعضهم ببعض এর অর্থ এটাই। যদি আল্লাহ তা‘আলা হক্কের দ্বারা বাতিলের মুকাবিলা না করাতেন তাহলে এ যমীনে টিকে থাকা সম্ভব হতো না, সর্বত্র সীমাহীন বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়তো।

আমি শুকরিয়া জানাই মুফতী সাহেব হুযূরের, কেননা বর্তমানে সহীহ হাদীস মানার নামে যে ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে; তিনি সবার আগে এটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। যদিও তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ কমজোর হয়ে গেছে, কিন্তু দ্বীনের কাজের ক্ষেত্রে আমাদের মতো হাজারো কিংবা লাখো আলেমদের চাইতেও তিনি

বেশী সতর্ক ও সমঝদার। আহলে হাদীস নামধারী বিভ্রান্ত ফিরকা আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে এবং জনসাধারণকে উলামায়ে কিরাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে। এহেন মুহূর্তে জনগণকে এ ফিতনা থেকে বাঁচানো জরুরী। এটা তিনি উপলব্ধি করতে পেরে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কিছুদিন আগে চট্টগ্রামে এ ব্যাপারে সম্মেলন হয়েছে। অতঃপর উত্তর বঙ্গের বগুড়া জামিল মাদরাসায় সম্মেলন হলো। সে এলাকার বহু উলামায়ে কিরাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া সেখানে তিনদিন ব্যাপী একটি তারবিয়াতী কোর্সের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিলো, যেনো এ ব্যাপারে জনসাধারণ একটি মজবুত ধারণা নিতে পারেন এবং সহজে এ ফিতনা প্রতিরোধ করতে পারেন। তথ্য-উপাত্ত সবার কাছেই আছে, কিন্তু সেটা পেশ করার তরীকা সবার জানা নেই। কুরআন-হাদীসে নতুন কিছু নেই, নতুন বললে তো বিদ‘আত হয়ে যাবে। যা বলবো তা-তো আপনাদের কাছেই আছে। وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (সূরা নাহল; আয়াত ১২৫)-এর সেই ‘আহসান’ তরীকাটা কী? কীভাবে বললে এ ফিতনার দফারফা হবে? কীভাবে আমরা নিজেদের দ্বীনকে রক্ষা করতে পারবো? কীভাবে জনগণকে রক্ষা করতে পারবো? এর কিছু হিকমত এবং কিছু কৌশল আপনাদের সামনে মুযাকারা করা হবে ইনশা-আল্লাহ। আপনারা যদি সেগুলো লিপিবদ্ধ করেন, রেকর্ড করেন এবং যে যেখানে থাকেন সেখানে গিয়ে মুযাকারা করেন তাহলে আশা করা যায়, এ ফিতনা খুব দ্রুত খতম হয়ে যাবে। এভাবেই যুগে যুগে বাতিল মাথাচাড়া দেয়। এসবের মধ্যে আল্লাহ তা’আলার এ হিকমত থাকতে পারে যে, উম্মতের দ্বীনী বিষয়ে উলামায়ে কিরাম কতোটুকু ফিকিরমান্দ তা পরীক্ষা করা। এজন্য যখনই বাতিল মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তখনই হক্বপন্থী উলামায়ে কিরাম তাদের মুকাবিলা করে জনগণের সামনে তাদের প্রকৃত চেহারা উন্মোচিত করে দেন। ফলে তারা লেজ গুটিয়ে পালায়।

আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুফতী সাহেবের হায়াতে বরকত দান করুন এবং তার হায়াতকে আমাদের মাঝে দীর্ঘায়িত করুন। আজকের ‘সম্মেলন’ সময়ের এক আহাম দাবী, যা তিনি নিজের কাঁধে নিয়েছেন এবং আপনাদেরকে দাওয়াত করে এনেছেন। শুধু তাই নয়, আপনাদের আত্মিক খোরাক দেয়ার উদ্দেশ্যে ভারতের একজন মেহমানকেও দাওয়াত দিয়েছেন। দু‘আ করুন যেনো আল্লাহ তা‘আলা মেহমানকে সহীহ-সালিম আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন এবং তার থেকে ভরপুর ইস্তিফাদা করার তাওফীক দান করেন।

ফিতনার পূর্বাভাস

‘হাদীসের নামে’ এমন একটা ফিতনা যে মাথাচাড়া দিবে, মানুষকে বিভ্রান্ত করবে, খাঁটি মুসলমানদেরকে মুশরিক বলবে, হাদীসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ও দিকনির্দেশনা রয়েছে। আলোচনার প্রারম্ভে আমি একটি হাদীস পড়েছি। আপনারা সবাই বুঝেছেন যে, এ হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের

ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং আমাদের করণীয় কী, সে দিকনির্দেশনাও তিনি দিয়েছেন। আপনাদের বুঝার সুবিধার জন্য এবং বরকত লাভের আশায় হাদীসটি তরজমা করছি। অন্যথায় আলেমদের এ মাহফিলে তরজমা করার কোনো প্রয়োজন নেই। মুসলিম শরীফের হাদীসে (হা.নং ৭) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ 'শেষ যামানাতে কিছু ফেরেববাজ ও ধোকাবাজের আবির্ভাব ঘটবে।' يَكُونُ শব্দ দ্বারা তিনি ভবিষ্যত সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটি ভবিষ্যদ্বাণীই অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে ইনশা-আল্লাহ। অন্যদিকে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী যতোগুলো ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো তার একটা হরফও বাস্তবায়িত হয়নি। অবশ্য ভবিষ্যদ্বাণী নয়, শুধু তার একটা বদ দু'আর বাস্তবায়ন হয়েছে। সে তার মাহফিলগুলোতে এই বলে বদ দু'আ করতো যে, 'হে আল্লাহ! আমি যদি সত্য নবী না হই তাহলে আমার মৃত্যু যেনো বেইজ্জতির সাথে হয়'। যেমন : আবু জাহেল বলতো, اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ 'হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের দ্বীন যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদেরকে পাথর বর্ষণ করে ধ্বংস করে দাও। (সহীহ বুখারি; হা.নং ৪৬৪৮)। লক্ষ্য করুন, কেমন দু'আ! যার দু'আ করা উচিত ছিলো- 'হে আল্লাহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য হলে আমাদেরকে তার দা'ওয়াত কবুল করার তাওফীক দান করো।' সে তা না করে বললো যে, আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করে ধ্বংস করে দাও। গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীও একই কাজ করেছে!! সে বলতে পারতো যে, 'হে আল্লাহ! আমি যদি মিথ্যা নবী হয়ে থাকি তাহলে আমাকে তাওবা করার তাওফীক দান করো, আমাকে হেদায়াত দান করো'। কিন্তু সে বলেছিলো, 'আমাকে বেইজ্জতের সাথে মৃত্যুদান করো'। ফলে আল্লাহ তাকে বেইজ্জতির সাথেই মৃত্যু দিয়েছেন। কাঁচা বাঁশের তাজা পায়খানায় পড়ে মারা গেছে। সেজন্য আজও টয়লেটকে কাদিয়ানীদের অফিস বলা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার খাস রহমত যে, কাদিয়ানীর কোনো ভবিষ্যদ্বাণীই ফলেনি, শুধু এ বদ দু'আটি ছাড়া। কিন্তু আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলে গেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং হবে। যেমন : তিনি বলেছেন যে, শেষ যামানায় কিছুলোক আসবে; তাদের কাজ হবে, يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ، وَلَا آبَاؤُكُمْ (সহীহ মুসলিম: ৭) অর্থাৎ তারা লোকদের সামনে বিভিন্ন হাদীস পেশ করবে। এখানে ইঙ্গিতকৃত 'হাদীসে'র অর্থ কী? অর্থ হলো- তারা যা পেশ করবে তা হতে পারে নবীজীর হাদীস। আবার এর অর্থ আমাদের কথাবার্তাও হতে পারে। আমাদের কথাবার্তাকেও হাদীস বলা হয়। এর সমর্থনে আমি একটি দলীল পেশ করছি। হাদীসে এসেছে, كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَلَا يُحِبُّ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৯৭৮১) নবীজী

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার পূর্বে ঘুমানো এবং ইশার পর গল্প-গুজব ও দুনিয়াবী আলোচনা অপছন্দ করতেন। অর্থাৎ, অপ্রয়োজনীয় গল্প-গুজব, নেতা-নেত্রীদের আলোচনা এবং মিথ্যা সমালোচনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। উল্লিখিত হাদীসের মধ্যে اَلْحَدِيْثُ শব্দটি ‘গল্প-গুজব ও দুনিয়াবী আলোচনা’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং হাদীসের এ অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, তারা এমন হাদীস পেশ করবে কিংবা এমন কথা বলবে- যা তোমরাও শুনোনি এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও শুনেনি। তথাকথিত ‘আহলুল হাদীস’ এরূপ কথা-বার্তা বলছে কি না? বারো’শ বছর ধরে যে আবু হানীফা রহ.কে সবাই শ্রদ্ধা করে আসছে, মুহাব্বত করে আসছে, এরা তাকে গালি দিচ্ছে। অথচ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ আলেম জটিল মাস’আলায় তার তাকলীদ বা অনুসরণ করে। তবে হ্যাঁ, সহজ মাস’আলায় কাউকে তাকলীদ করার প্রয়োজন নেই। নামায পাঁচ ওয়াক্ত। এখানে কোনো তাকলীদ নেই। কিছু মাস’আলা জটিল আছে। সেখানে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনই চেয়েছেন যে, মাযহাব সৃষ্টি হোক। অন্যথায় আল্লাহ সুস্পষ্ট শব্দ নাযিল করতেন। দুই অর্থ বিশিষ্ট ‘শব্দ’ নাযিল করতেন না। তিনিই চেয়েছেন যেনো ঐসব জায়গাতে আমরা মাযহাব মানি। আমরা- তো আবু হানীফা রহ.কে নবী মানি না। অথচ ওরা এ অপবাদ দিচ্ছে যে, তোমরা তাকে নবী মানো। সুতরাং তোমরা বেঈমান, মুশরিক হয়ে গেছো। আমাদের ঢাকার মুহাম্মাদপুরে একলোক তথাকথিত ‘আহলুল হাদীস’ হয়েছে। এখন কোনো হানাফী তাকে সালাম দিলে সে তার উত্তরে বলে, وعليكم السلام و رحمة الله على من اتبع الهدى অর্থাৎ কাফেরদেরকে যে বাক্যের মাধ্যমে সালাম দিতে বলা হয়েছে, সে হানাফীদেরকে ঐ ধরনের বাক্য দ্বারা সালামের উত্তর দিচ্ছে!! (নাউযুবিল্লাহ)।

ঢাকার মুহাম্মাদপুর ‘রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ’-এর পাশে ‘আলামীন’ নামে ওদের একটি মসজিদ আছে। ঐখানে দুই-তিনমাস পরপর সম্মেলন হয়। উদাহরণস্বরূপ, সেখানে একজন দাঁড়িয়ে বলবে যে, আমি গতমাসে মুসলমান হয়েছি! কেউ বলে, আমি তিনমাস আগে মুসলমান হয়েছি! একেকজন একেকরকম বলে। কেউ আবার জিজ্ঞাসা করে যে, আপনি আগে কোন ধর্মে ছিলেন? সে উত্তরে বলে, আমি আগে হানাফী ধর্মে ছিলাম। সেখান থেকে তাওবা করে আমি এখন মুসলমান হয়েছি। (নাউযুবিল্লাহ) এমন কথা আপনাদের বাপ-দাদারা শুনেছেন? হানাফী থেকে কি মুসলমান হওয়া যায়? তারা আরো বলে, কাযা নামায বলতে কিছু নেই। কাযা নামাযের জন্য তাওবা করে নিলেই যথেষ্ট! অথচ আপনারা জানেন যে, হাদীসের প্রত্যেকটি কিতাবে باب قضاء الفوائت ‘কাযা নামায আদায়’ শিরোনামে বিশাল একটা অধ্যায় রয়েছে। সেখানে কাযা নামায কীভাবে আদায় করতে হয় তার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তবে কি তারা বলতে চায় যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত শত হাদীস

মিথ্যা? অথচ তাদের দাবী, তারা আহলুল হাদীস। আমরা বলি, প্রকৃতপক্ষে তারা আহলুল হাদীস নয়, বরং তারা হাদীসের ঘোরতর শত্রু

তারা বিভিন্ন ধরনের অনেক বিভ্রান্তিকর কথা দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। অথচ বুখারী শরীফ খুলে দিলে পড়তেও পারে না। শুধু ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হাদীসের অনুবাদ গ্রন্থগুলো বগলে রাখবে, আর সবাইকে দা'ওয়াত দিবে, 'এটা বগলে রাখো তাহলে তোমার আর মাযহাব মানা লাগবে না'। ঐখান থেকে খুলে খুলে বলবে, এই যে দেখো! বুখারী শরীফে এসেছে- আমীন জোরে বলতে হবে, তোমরা হানাফীরা জোরে 'আমিন' বলো না, কাজেই তোমাদের নামায বাতিল। অথচ বুখারী শরীফে এধরনের কোনো হাদীসই নেই! বুঝুন, ধোঁকাবাজি কাকে বলে!! এখানেই শেষ নয়! তারা আমাদেরকে বলে, তোমাদের কাছে হাদীসের কোনো দলীল আছে? তোমাদের ইমাম আবু হানীফা মাত্র সতেরোটা হাদীস জানতো! বাকী সব ক্বিয়াস করেছে। অথচ আমাদের মক্তবের ছাত্রদেরও চল্লিশটি হাদীস মুখস্ত!! আর যাকে সমস্ত ইমামগণ 'ইমামে আযম' বলেছেন তিনি জানতেন মাত্র 'সতেরোখানা হাদীস'!!! এমন কথাতো পাগলেও বলে না।

ইমাম শাফিঈ রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ. সম্পর্কে বলেছেন, الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه (তারিখে বাগদাদ, খতীবে বাগদাদী ১৫/৪৭৩) 'ফিক্বহের ক্ষেত্রে সমস্ত উলামায়ে কিরাম আবু হানীফা রহ.-এর পরিবারভুক্ত'। ইমাম আবু হানীফা রহ. উসূল ইস্তিম্বাত করেছেন। আর ঐ উসূলের আলোকে চারজন ইমামই কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মাস'আলা বের করেছেন। তারা একজনও এ উসূল পরিবর্তন করেননি এবং নতুন উসূল উদ্ভাবনও করেননি। এছাড়াও, আলহামদুলিল্লাহ! ইমাম সাহেব রহ. কিয়ামত পর্যন্ত আগত মাস'আলার সম্ভাব্য যতো সূরত হতে পারে সেগুলোর অধিকাংশ সূরতের এক একটা ফায়সালা দিয়ে গেছেন। এজন্যই-তো আমরা আজ অনায়াসে ফাতাওয়া দিতে পারছি। এ কাজটি যদি তিনি না করতেন তাহলে বিদায় হজ্জে অবতীর্ণ এ আয়াতের অর্থ কী হতো? الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا 'আজকে আমি তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে 'পরিপূর্ণ' করে দিলাম।'(সূরা মায়িদা : ৩)। ইমাম সাহেব যদি উদ্ভূত মাস'আলাগুলোর সমাধান পেশ না করতেন তাহলে আমরা এগুলো কোত্থেকে সমাধান করতাম? আর যখন সমাধান করতে পারতাম না তখন কাফেররা বলতো যে, তোমাদের আল্লাহ না বলেছে তোমাদের দ্বীন 'মুকাম্মাল'? তোমাদের দ্বীনে-তো বহু মাস'আলার সমাধান নেই?!! বহু বিষয়ের কোনো উত্তর নেই!!! এ অবস্থায় আহলুল হাদীসরা কী বলবে? তারা-তো ক্বিয়াস মানে না, ইমাম মানে না, ফক্বীহ মানে না!! তাহলে এ মাস'আলাগুলোর উত্তর তারা কীভাবে দিবে?

চুরি কাকে বলে

দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক মুফতী-ই-আ’যম হযরত মাওলানা মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী রহ.-যিনি সমগ্র ভারত উপমহাদেশের বড় মুফতী ছিলেন, তিনি তার একজন আহলুল হাদীস উস্তাদের কিচ্ছা নকল করতে গিয়ে বলেন, ‘একবার তিনি উস্তাদের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে দেখেন যে, উস্তাদ হিদায়া কিতাব মুতা‘আলা করছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, হুযূর! আপনি না আহলুল হাদীস? চার ইমাম মানেন না। তাদের ইজমা-ক্বিয়াসও মানেন না। অথচ হানাফীদের লেখা ‘হিদায়া’ কিতাব মুতা‘আলা করছেন? উস্তাদ-তো ধরা পড়ে গেলেন। এখন অকপটে বললেন, ‘বাবা! আমাদের কাছে যে নতুন নতুন ফাতাওয়া আসে, এগুলোর সমাধান আমরা কোত্থেকে পেশ করবো? এগুলোর একটাও-তো কুরআনে স্পষ্ট বলা নেই, হাদীসেও স্পষ্ট বলা নেই। এজন্য আমরা বাধ্য হয়েই ‘হিদায়া’ দেখে উত্তর লিখি। এরপর কিতাবের পার্শ্বটিকায় যে হাদীস আছে সেটা উঠিয়ে দেই। ভুলক্রমেও ‘হিদায়া’র নাম নিই না। এভাবেই ধোঁকবাজির মধ্যদিয়ে আমাদের মতবাদটা চলছে।’ মুফতী সাহেব উস্তাদকে প্রশ্ন করলেন, তাহলে জেনে শুনে এ ধরনের কাজ কেনো করেন? উস্তাদ উত্তরে বললেন, ‘আরে বোকা! এভাবে না করলে কি টাকা কামানো যায়?!’ আসলে যে যেভাবে চলতে চায় আল্লাহ তাকে সেভাবেই চালান। যারা ভুলপথে টাকা খোঁজে, আল্লাহ তাদেরকে ভুলপথেই টাকা দিয়ে থাকেন। আপনি সহীহভাবে খেদমত করুন, আল্লাহ আপনাকে সহীহভাবেই দেবেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ‘তারা এমন সব কথা বলবে যা তোমরাও শুনোনি, তোমাদের বাপ-দাদারাও শুনেনি।’ এবার আপনারাই বলুন, এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে কী? হয়েছে। এখন এ ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় কী? মুসলিম শরীফের হাদীস, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, فإياكم وإياهم ‘ওদের থেকে দূরে থাকো।’ لايضلونكم ولايفتنونكم ‘আর সতর্ক থেকো যেনো তারা তোমাদেরকে গোমরাহ করতে না পারে, ফিতনায় ফেলতে না পারে।’(হা.নং ৭) সেই সতর্ক থাকবার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই আপনাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে এবং একত্রিত করা হয়েছে।

আমাদের করণীয়

আসুন জেনে নিই নায়েবে রাসূল উলামায়ে কিরামের দায়িত্ব কী? কুরআন-হাদীস পর্যালোচনা করলে দুই ধরনের দায়িত্ব পাওয়া যায়। একটি হলো মৌলিক দায়িত্ব যা সবসময় করতে হবে - দা’ওয়াত, তা’লীম ও তাযকিয়াহ। এ তিন লাইনে মেহনত করে পাঁচটি বিষয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে সজাগ করতে হবে। (এক) আক্বাইদ, (দুই) ইবাদাত, (তিন) মু‘আমালাত, (চার) মু‘আশারাত ও (পাঁচ) আখলাকিয়্যাত। দা’ওয়াত, তা’লীম ও তাযকিয়াহ এ তিনটি নবীজী সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাছ। শুধু একটি নিয়ে বসে থাকলে প্রকৃত নায়েবে রাসূল হওয়া যাবে না। পিতা যা কিছু রেখে যায় সন্তানরা সবাই তাতে অংশীদার হয়। এমন নয় যে, বোনেরা ধানক্ষেত নিবে, আর ভাইয়েরা বিল্ডিং পাবে। বরং ধানক্ষেতেও সবাই অংশীদার, আবার বিল্ডিংয়েও সবাই অংশীদার। মহান আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (সূরা আল ইমরান; আয়াত ১৬৪)

এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা উপরোক্ত তিন মেহনতের কথাই তুলে ধরেছেন। এ তিন লাইনে মেহনত করে কী শিখবেন তা অন্য আয়াতে আছে। মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন, لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (সূরা বাক্বারা; আয়াত ১৭৭)।

এখানে পাঁচটি বিষয় বলা হয়েছে- ১. ঈমান ঠিক করা, ২. ইবাদাত বন্দেগী সুন্নাত মুতাবিক করা, ৩. মু‘আমালাত অর্থাৎ অর্জিত সম্পদ হালাল হওয়া, ৪. মু‘আশারাত ঠিকভাবে করা অর্থাৎ মা-বাবা, বিবি-বাচ্চাসহ সকলের হক্ব সঠিকভাবে আদায় করা। সহীহ বুখারীতে (হা.নং ১০) পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে, الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
যার মর্মার্থ হলো- যে অযথা অন্যকে কষ্ট দেয় তাকে আমরা হাজী সাহেব, গাজী সাহেব, তাহাজ্জুদ গুজার আরো অনেক কিছু বলতে পারি, কিন্তু তাকে মুসলমান বলা যাবে না। অর্থাৎ যে বান্দার হক্ব নষ্ট করে, অযথা অন্যকে কষ্ট দেয় তাকে মুসলমান শিরোনাম দেয়া যাবে না। ৫. আখলাক ঠিক করা অর্থাৎ কাউকে কষ্ট না দেয়া। এ পাঁচটি বিষয়ের ‘ইলমকে বলা হয়, ‘ইলমে ফরযে ‘আইন। আর মাওলানা, মুফতী, মুহাদ্দিস এগুলো হওয়া ফরযে কিফায়া। ‘কিফায়া’-র জন্য দু’চারজন লোক যথেষ্ট নয়, বরং ‘কাফী’ বা যথেষ্ট পরিমাণ লোক লাগবে যাতে সমাজের প্রয়োজন পূরণ হয়। আমাদের দেশে এখনো ‘কাফী’পরিমাণ লোক তৈরি হয়নি। যমুনা ব্রিজের ওপারে অধিকাংশ মসজিদে এখন পর্যন্ত নামায সহীহ হয় না। আমি অনেকবার ‘উত্তরবঙ্গ’ গিয়েছি; লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়সহ আরো অনেক জায়গায় সফর করেছি। ঐসকল জায়গায় যতো ইমামের পিছনে নামায পড়েছি সেগুলোর অধিকাংশ-ক্ষেত্রে নামায দোহরাতে হয়েছে। কিরা‘আত পড়েছে, ما كان محمد এর স্থলে مكان محمد। আপনারাই বলেন, এরপরও কি নামায সহীহ থাকে? নামায নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং এখনো ফরযে কিফায়া পরিমাণ আলেম লোক বাংলাদেশে তৈরি হয়নি। তাই এ মুহূর্তে কোনো আলেমের জন্য দেশের দ্বীনী জরুরতের উপর দৃষ্টি না দিয়ে ডলার আর রিয়ালের বাসনায় বিভিন্ন দেশে পাড়ি দেয়া ঠিক হয় কী করে?

আমি বলছিলাম যে, পাঁচটি বিষয়ের ‘ইলম অর্জন করা ফরযে ‘আইন। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, ‘আমানত পাওনাদারের কাছে পৌঁছিয়ে দাও।’ (সূরা নিসা; আয়াত ৫৮)

প্রশ্ন হচ্ছে আমানত কী? শাইখুত তাফসীর ওয়াল হাদীস হযরত মাওলানা ইদ্রিস কান্ধলভী রহ. বহু তাফসীর গ্রন্থের হাওলা দিয়ে বলেছেন যে, আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ‘ইলমে ফরযে ‘আইন। এ আমানত আল্লাহ তা‘আলা উলামাদের কাছে রেখেছেন। আর এর পাওনাদার হলো মুসলিম জনসাধারণ। এ আয়াতে উলামায়ে কিরামকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যে, তারা যেনো এ আমানত অর্থাৎ উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের ‘ইলমকে দা’ওয়াত, তা’লীম ও তাযকিয়ার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়। এটা উলামাদের মৌলিক দায়িত্ব। শুধু ছাত্র পড়ালে, কিংবা শুধু ইমামতি করলে এ দায়িত্ব আদায় হবে না। মুসলিম জনসাধারণের দুয়ারে দুয়ারে যেতে হবে। দা’ওয়াত পেলেও যেতে হবে; দাওয়াত না পেলেও যেতে হবে। দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে, সকলের আত্মশুদ্ধির ফিকির করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ এ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘(হে আমার প্রিয় হাবীব!) আপনাকে আমি যে এক বিশাল নূর দান করেছি, সে নূর জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিন।’ (সূরা আনআম; আয়াত ১২২)

পৃথিবীর সর্বত্র এ নূরের মশাল হাতে নিয়ে ছড়িয়ে পড়তে হবে। এটা উলামায়ে কিরামের মৌলিক দায়িত্ব। সারাজীবন এটি করতে হবে।

উলামায়ে কিরামের অপর দায়িত্বটি হলো : যখনই কোনোদিক দিয়ে বাতিল মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করবে; তখনই ময়দানে নামতে হবে। বাতিলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধুলিস্যাৎ করতে হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ (শরহু মুশকিলিল আছার, ত্বহাবী; হা.নং ৩৮৮৪)

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্য হতে যাদের তবীয়তে ইনসাফ আছে, তাক্বওয়া আছে; তারাই আমার এ ‘ইলম শিখতে পারবে। সবাই শিখতে পারবে না। এরপর তাদের কাজ হবে, ينفون عنه تحريف الغالين অর্থাৎ তারা দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনকে বিদূরিত করবে। وانتحال المبطلين অর্থাৎ কাফিররা কুরআন-হাদীস থেকে দলীল সংগ্রহ করে সেগুলোকে বিকৃত করে উপস্থাপন করবে যাতে নিজেদের মিথ্যা মাযহাবকে প্রমাণ করা সম্ভব হয়। ঠিক যেমনটা কাদিয়ানী এবং

শি‘আ সম্প্রদায় করছে। উলামায়ে কিরাম এসব মিথ্যাকে রদ করবে। وانتحال المبطلين ‘মুবতিল’ অর্থ ‘কাফির’।وتأويل الجاهلين জাহেলদের তাফসীরকে রদ করবে। তাফসীরের আরেক নাম হল ‘তাবীল’। জাহেল কাকে বলে? মনে রাখবেন, তাফসীর করার জন্য পনেরোটি বিষয়ের ‘ইলম থাকা শর্ত। যথা-

اشتقاق، نحو، صرف، معاني، بيان، بديع، قراءة، قصص، لغة، عقائد، فقه، حديث، ناسخ منسوخ، أسباب النزول، تزكية الباطن

হাদীসে এসেছে, مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (শুআবুল ঈমান,বাইহাকী: ২০৭৯)

এ হাদীসের তাফসীর দেখুন,

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ، أَوْ بِمَا لَا يَعْلَمُ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

অর্থঃ রায়ের দ্বারা যে তাফসীর করবে সে যেনো তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়। (আসসুনানুল কুবরা,নাসাঈ: ৮০৩১)

আপনারা সবাই এ হাদীসটি পড়েছেন। আমি-তো শুধু এখানে ইশারা করবো মাত্র। উপরিউক্ত পনেরোটি বিষয়ের ‘ইলম যার মাঝে থাকবে তার তাফসীর করার এবং তাফসীর লেখার অধিকার আছে। আহলুল হাদীসরা-তো এ পনেরোটি ‘ইলমের নামও বলতে পারবে না। তারা যদি তাফসীর করতে আসে তাহলে তাদেরকে বলুন, আগে এ পনেরোটি ‘ইলমের নাম বলেন! এরপর তাফসীর করেন। যার এ পনেরোটি ‘ইলম নেই তাকে এ হাদীসে জাহেল বলে অভিহিত করা হয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যাদের এ বিষয়গুলোতে পারদর্শিতা নেই তারা গলদ তাফসীর করবে।’ উলামায়ে হক্কানীর দায়িত্ব হলো, এ গলদ তাফসীরকে প্রতিহত করা। সুতরাং উল্লিখিত হাদীস থেকে আমরা বুঝলাম যে, আমাদের মৌলিক দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও আরো কিছু করণীয় আছে। সেগুলো হলো-অবান্তর ব্যাখ্যাকারীদের প্রতিহত করতে হবে, মুসলিম পরিচয়ে ছদ্মবেশী কাফিররা আমাদের যে সকল দলীলের অপব্যাখা করে সেগুলো উদ্ধার করতে হবে। আর মূর্খ লোকেরা (যাদের তাফসীর করার যোগ্যতা নেই) যে তাফসীর করছে সেগুলো বাতিল করতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, কুরআন-হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যাকারী কারা? যামানাভেদে এদের রূপ-চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু দল একটাই। আমাদের যামানাতে এরা হলো-

(এক) রিজভী ফিরকা

যারা বলে বেড়ায় মিলাদ না পড়লে কাফির, কিয়াম না করলে কাফির, মাজারে মাজারে না ঘুরলে কাফির, উলামায়ে দেওবন্দ কাফির, জশনে জুলুস অর্থাৎ ঈদে মিলাদুন্নাবী না করলে কাফির (নাউযুবিল্লাহ)। অর্থাৎ কথায় কথায় কাফির

ফাতাওয়া দেয়া এদের স্বভাব! এ ফিরকার হেড অফিস আমাদের মুহাম্মাদপুরে, ‘কাদেরিয়া তায়্যিবিয়্যাহ’। এটি কাফির বানানোর মেশিন! আমরা মানুষকে মুসলমান বানাচ্ছি, অন্যদিকে এরা মুসলমানকে কাফির বানাচ্ছে। তারা বলে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন এবং তিনি হাযির-নাযির! তারা আরো বলে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নূরের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ নিজের নূর থেকে কিছু কেটে তা দিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন! (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ যে নূরের তৈরি এর দলীল কী? এ জাহিলরা এর দলীল দেয়, اَللّٰهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (সূরা নূর; আয়াত ৩৫)। অথচ এ আয়াতে এমন কোনো দলীল নেই। বরং এ আয়াতের অর্থ ‘আসমান-যমীনের সকল নূর ও আলো আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টি করেছেন।’ আল্লাহ নূরের তৈরি সেকথা এখানে কোথায় পেলো তারা? তিনি কিসের তৈরি তা কেউ বলতে পারবে না। কোথাও এ বিষয়ে আলোচনা নেই। এক বর্ণনায় শুধু এতোটুকু জানা যায় যে, حِجَابُهُ النُّورُ অর্থাৎ আল্লাহ নিজেকে যে হাজার হাজার পর্দা দিয়ে বেষ্টন করে রেখেছেন ঐ বেষ্টনিগুলো নূরের তৈরি। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৭৯) আর এ ভন্ডরা বলছে যে, আল্লাহ নূরের তৈরি। এগুলো আসলে বাড়াবাড়ি। সুতরাং উলামায়ে কিরামকে সেটা প্রতিহত করতে হবে। এ ফেতনার জন্মদাতা আহমাদ রেজা খান। তার জন্মস্থান হিন্দুস্তানের ‘উল্টাবাঁশবেরেলী’ শহরে।

(দুই) হাদীসে উল্লিখিত দ্বিতীয় দলটি হলো, তথাকথিত আহলুল হাদীস।

আমরা কালিমা পড়েছি, আমরা মুসলমান, এরপরও তারা আমাদেরকে মুশরিক বলে, বেঈমান বলে। আমরা সহীহ পদ্ধতিতে নামায আদায় করি, অথচ তারা আমাদের নামাযকে বাতিল বলছে। আবু হানীফা রহ. যিনি উম্মতের জন্য নিজের জীবনটা বিলিয়ে দিয়েছেন (আবু হানীফা সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ ‘ইলমের কোনো অংশ যদি ‘সুরাইয়া’ নক্ষত্রে গিয়েও লুকায়, তবে সে যুগে এমন কিছু লোক তৈরি হবে যারা ‘ইলমকে সেখান থেকে ছিনিয়ে আনবেন। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৯৪৪০) এ হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম আবু হানীফা রহ. সম্পর্কে ঈঙ্গিত করে গেছেন।) সেই আবু হানীফা রহ.কে তারা গাল-মন্দ করছে। এগুলো কি বাড়াবাড়ি নয়? তাহলে تحريف الغالين কারা সাব্যস্ত হলো? দুটি দল- (এক) রিজভী ফিরকা। (দুই) তথাকথিত আহলুল হাদীস।

আর ‘মুবতিল’ হলো, কাদিয়ানী ও শি‘আ সম্প্রদায়। ‘মুবতিল’ হতে হলে কাফির হতে হবে। সেজন্য সংগত কারণেই এ দুই ফিরকা কাফির। কাদিয়ানীরা কাফির, নতুন নবী মানার কারণে; আর শি‘আরা কাফির নতুন নবীর চেয়ে পাওয়ারফুল

ইমাম মানার কারণে। এতো পাওয়ারফুল ইমামই যদি আসে, তাহলে-তো এর চাইতে নবী আসাই ভালো ছিলো! শি‘আদের ধর্মগুরু খোমেনি বলেছে, ‘আমাদের ইমামের এতো বড়ো মাকাম যে, কোনো ফেরেশতা, কোনো নবী-রাসূল তার ধারে কাছেও যেতে পারবে না।’ এমন ইমাম যদি আসতে পারে তাহলে নবী আসতে সমস্যা কী? এটা সুকৌশলে খতমে নবুওয়াতের অস্বীকৃতি। তাদের কুফরির আরেকটি নমুনা হলো-তারা আমাদের বর্তমান কুরআন শরীফকে মানে না। তারা বলে, এটা আসল কুরআন শরীফ না। আসল কুরআন শরীফ হতে হলে সতেরো হাজার আয়াত থাকতে হবে!! আর আমাদের কুরআন শরীফে মোট আয়াত ৬২৩৬টি। ৬৬৬৬-আয়াত এর যে প্রচলন হয়েছে সেটা ভিত্তিহীন। আল্লাহ না করুন, যদি কোনো কাফির চ্যালেঞ্জ করে যে, আপনাদের কুরআনে কতো আয়াত? আর কেউ বলে ফেলে ৬৬৬৬। তখন ঐ কাফির বলতে পারে যে, ক্যালকুলেটর নিয়ে এসেছি একটু হিসাব মিলিয়ে দিন! সূরা ‘বাক্বারা’র এতো আয়াত, সূরা ‘আলে ইমরানে’র এতো আয়াত, সূরা ‘নিসা’র এতো আয়াত সব মিলালে ৬২৩৬ হয় বাকি ৪৩০ আয়াত কোথায়? মিঞা! মুসলমান দাবী করেন, অথচ কুরআনের কতোটি আয়াত সে খবর রাখেন না! আবার আমাকে ইসলামের দা’ওয়াত দিতে এসেছেন!! কাফিররা কি কম শয়তান? আমার এক ছাত্র একবার এক কাফিরকে বললো, ভাই! কালিমা পড়েন। ঐ কাফির বললো, আমরা-তো প্রতিদিন কালিমা পড়ি। ছাত্রটি জিজ্ঞাসা করলো কীভাবে? উত্তরে সে বলল, আমরা ‘মা’ শব্দটি আগে এনে ‘মা কালি’ বলি। কতো বড়ো শয়তান! এভাবে নাকি সে কালিমা পড়ছে!!

যা-হোক, বলছিলাম যে, শি‘আরা আমাদের এ কুরআন শরীফ মানে না। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তোমাদের অরিজিনাল কুরআন শরীফ কোথায়? এ ব্যাপারে তাদের থেকে দুটি উত্তর এসেছে-

(১) সেটা তাদের বারোতম ইমামের কাছে আছে। এখন তিনি মেঘের মাঝে অবস্থান করছেন। তবে কিয়ামতের আগ মুহূর্তে পৃথিবীতে আগমন করবেন। (নাউযুবিল্লাহ)।

(২) ইরাকের মধ্যে একটি গুহা আছে যার নাম ‘সুররা মান রআহু’। সেখানে তাদের বারোতম ইমাম লুকিয়ে আছে। যখন মক্কা-মদীনাসহ পুরো অঞ্চল শি‘আদের দখলে চলে আসবে তখন তিনি অরিজিনাল কুরআন নিয়ে বের হয়ে আসবেন।

এজন্যই শি‘আরা প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছে। তারা ইরাক ও ফিলিস্তিন ধ্বংস করেছে। আর সিরিয়া-তো তাদের দখলে আছেই।

যেখানে কুরআনের একটি আয়াত অস্বীকার করলেই কাফির হয়ে যায়, সেখানে তারা পূর্ণ কুরআনকে অস্বীকার করে। এছাড়াও, তাদের অন্য একটি রোগ হলো- দলীল বিকৃত করে উপস্থাপন করা। সুতরাং এদেরকেও প্রতিহত করতে হবে।

এছাড়া وتأويل الجاهلين মূর্খদের তাফসীরকে প্রতিহত করতে হবে। আর এ জাতীয় মূর্খদের হেড অব দ্যা ডিপার্টমেন্ট হলো মিস্টার মওদুদী। তার ভক্তবৃন্দরা বলে, আপনারা মওদুদী সাহেবের সমালোচনা করেন, কিন্তু তার মতো এমন তাফসীর লিখতে পারবেন? আরে বোকা! জেনে শুনে এমন কাজ-তো পাগলেও করবে না!! কারণ কোনো আহলে হক্ব ব্যক্তির পক্ষে এমন মনগড়া তাফসীর রচনা করা সম্ভব না। এটা এতোটাই উন্নত তাফসীর যে, এতে নবী-রাসূল আ. ও সাহাবায়ে কিরাম রাযি.-এর সমালোচনা খুব সাবলীল ভঙ্গিতে করা হয়েছে। কেউ যদি মেডিকেল সাইন্সের উপর নিজের বুঝ-বুদ্ধি অনুযায়ী একটা বই লিখে বাজারে ছেড়ে দেয়, অথচ সে কোনো প্রফেসরের কাছে মেডিকেল বিষয়ে এক লাইনও পড়েনি, তাহলে সেটা অসাধারণ বই হবে না? ডাক্তারদের সামনে পেশ করলে তারা-তো অবশ্যই বলবে, বাহ! চমৎকার বই তো!! সেটা যতো বড়ো বই-ই হোক না কেনো এর কোনো মূল্য আছে? এটা কেউ কিনবে? বরং বলবে যে, লোকটা বিকারগ্রস্থ নাকি? ঠিক এমনই হলো মওদুদীর তাফসীর। তিনি তাফহীমুল কুরআনে লিখেছেন, الم যখন নাযিল হয়েছিলো তখন সবাই এর অর্থ বুঝেছিলো। মওদুদী সাহেবকে প্রশ্ন করা হলো, তাহলে আপনি এর অর্থ বলুন? তিনি বললেন যে, পরবর্তীকালে এগুলোর পরিভাষা রহিত হয়ে গেছে। এখন আর এগুলোর অর্থ করা সম্ভব নয়। দলীল হলো- তখন কোনো সাহাবী এর অর্থ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করেননি। সবাই বুঝলে পরবর্তীকালে এগুলোর পরিভাষা রহিত হয়ে গেলো কি করে? জাহেল কাকে বলে! অতএব, তার তাফসীরকেও রদ করতে হবে। আর আমাদের যামানাতে এই تأويل الجاهلين এর কাজটি আঞ্জাম দিচ্ছে ডাক্তার জাকির নায়েক। তার সম্পর্কে আমার ফাতাওয়া একটি মাসিক পত্রিকাতে ছেপেছে। শুধু আমার ফাতাওয়া নয়, বরং দেওবন্দ, লাখনৌ, লাহোর-এর মাদ্রাসাগুলোর ফাতাওয়া বিভাগসহ মুফতী মুহাম্মদ তাক্বী উসমানীর ফাতাওয়া, আরব বিশ্বের ফাতাওয়া সযত্নে ছেপেছে। সেখানে এটা প্রমাণ করা হয়েছে কীভাবে সারা দুনিয়ার উলামায়ে কিরাম ডাক্তার জাকির নায়েককে ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তার মাজলিসে বসা, তার লেকচার শোনা সম্পূর্ণ নাজায়েয সাব্যস্ত করেছেন। বস্তুত তার দা’ওয়াতে ইসলামের কোনো উপকার হয়নি, বরং বহু মুসলমান টিভি খরিদ করেছেন। সুতরাং তাকে টিভি কোম্পানির এজেন্ট বলা যায়।

আমি শুরুতে বর্তমান ফিতনাগুলো সম্পর্কে অবহিতকরণ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ হাদীসটি পড়েছিলাম যাতে আপনারা মনে না করেন যে, এসব ফিতনা প্রতিরোধ

করা বোধ হয় আমাদের দায়িত্ব না। আসলে এটা যে আমাদের দায়িত্ব তা এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো।

তাকলীদ ও এর হাকীকত

এখন আসুন জেনে নেই, তাকলীদ কী এবং তাকলীদের হাকীকত কী? তাকলীদ কখন থেকে শুরু হয়েছে? তাকলীদের ব্যাপারে কোনো আপত্তি আছে কিনা?

তাকলীদ হলো কোনো মুজতাহিদের উপর আস্থা রেখে তার কথাকে মেনে নেয়া। উল্লেখ্য, কোনো নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ করা ওয়াজিব। এই তাকলীদ আমরা প্রত্যেকেই করছি। দ্বীন হোক আর দুনিয়া হোক। স্বাস্থ্য খারাপ হলে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া হয়। এখানে আমরা ডাক্তারের তাকলীদ করলাম। বিল্ডিং তৈরির জন্য ইঞ্জিনিয়ারের দিক নির্দেশনা ফলো করি। এক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারের তাকলীদ করলাম। মামলা-মোকদ্দমায় এডভোকেটের তাকলীদ করি। আর দ্বীনের জটিল বিষয়ে হানাফী মাযহাবের তাকলীদ হচ্ছে, নিজের মতের উপর আমল না করে তাবেঈনদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো আলেম যিনি ছিলেন তার কথার উপর আমল করা। দ্বীনের উপর চলার জন্য এটা সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা। আপনারা জানেন, বিশেষ করে যারা উলূমুল হাদীসের ছাত্র তারা-তো অবশ্যই জানে যে, সকল সাহাবীর ‘ইলম ছয়জন সাহাবীর মধ্যে জমা হয়েছিলো। আর সেই ছয়জনের ‘ইলম হযরত আলী রাযি. ও হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এ দু’জনের মধ্যে জমা হয়েছিলো। অতঃপর এ দুই সাহাবীর ‘ইলম দু’জন তাবেঈর মধ্যে জমা হয়েছিলো। তারা হলেন আলক্বামা ও আলআসওয়াদ। আর আলক্বামা ও আলআসওয়াদের ‘ইলম ইবরাহীম নাখঈর মাঝে, ইবরাহীম নাখঈর ‘ইলম হাম্মাদের মাঝে, আর হাম্মাদের ‘ইলম ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মাঝে জমা হয়েছিলো। তাহলে এটা প্রমাণিত হলো যে, সোয়া লক্ষ সাহাবার ‘ইলম আল্লাহ তা‘আলা ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর অন্তরে জমা করেছেন, সুবাহানাল্লাহ! এজন্য আবু ইউসূফ রহ. নিজেই স্বীকার করেছেন যে, আমরা শত তালাশের পর হাদীস জমা করে তার সামনে উপস্থিত করতাম আর ভাবতাম যে, এ হাদীসগুলো হয়তো তিনি জানেন না। কিন্তু আশ্চর্য! হাদীসগুলো পেশ না করতেই তিনি হাদীসের পূর্ণ তাফসিলী আলোচনা আমাদের শুনিয়ে দিতেন : এটি অমুক সাহাবী থেকে বর্ণিত, এটির সনদ সহীহ, ঐটির সনদ যঈফ ইত্যাদি। আবু ইউসূফ রহ. বলেন যে, আমরা অনেক খোঁজেও এমন কোনো নতুন হাদীস পেশ করতে পারিনি, যা আবু হানীফা রহ.-এর ‘ইলমে নেই। তাহলে দ্বীনের জটিল বিষয়ে নিজের বুঝ মতো না চলে আবু হানীফা রহ.কে অনুসরণ করা কি বেশি নিরাপদ নয়? দ্বীনের জটিল বিষয়ের মাস'আলা উদ্ভাবনের কাজটিই চার মাযহাবওয়ালারা করেছেন। এ চার মাযহাবের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। হ্যাঁ, আপোসে ছোটো-খাটো মতভেদ থাকতে পারে, তবে সেগুলি আক্বীদা-বিষয়ক ইখতিলাফ

নয়। বরং চার মাযহাবের সবাই আক্বীদার বিষয়ে হানাফী মাযহাবের লেখা ‘আক্বীদাতুত তাহাবী’ পড়ে থাকেন।

একবার বাগদাদের খলীফা ইমাম মালিক রহ.কে প্রস্তাব করলেন যে, আমি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলে আপনার ‘মুআত্তা’ কিতাবকে আমার শাসনাধীন এলাকাগুলোতে বাধ্যতামূলক করতে চাই। শুধু আপনি অনুমতি দিলেই হয়। ইমাম মালিক রহ. জবাবে বললেন, জনাব! এটা ঠিক হবে না। কারণ আমার মাযহাব পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা (অর্থাৎ আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, মরক্কোর লোকেরা) অনুসরণ করে। ওদিকে সিরিয়ায় ইমাম আওযাঈ রহ. এবং কূফায় ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর শাগরেদগণ আছেন। সুতরাং আপনি যদি এটাকে বাধ্যতামূলক করেন, তাহলে বিরাট ফিতনা সৃষ্টি হবে; মানুষের মাঝে বিভেদ ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং আপনি এ কাজ কখনোই করবেন না। (সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৭/১৪২) উল্লেখ্য যে, লোহিত সাগরের পশ্চিমে ইমাম মালেক রহ.-এর এক শাগরিদ ছিলেন ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া। তার মুআত্তার নূসখা আমরা পড়ি। তার মাধ্যমে ঐ এলাকায় ইমাম মালিকের মাযহাব চালু হয়েছে। উপরোক্ত ঘটনায় ইমাম মালিক কি অন্যান্য ইমামদের প্রতি সৌহার্দ দেখালেন না? মাযহাবওয়ালারা একে অপরকে যে মুহাব্বত করতেন সে সম্পর্কীয় আরো কিছু ঘটনা আপনাদেরকে শোনাবো ইনশা-আল্লাহ। তারা একে অপরকে গোমরাহ বলা-তো দূরের কথা কেউ কাউকে কখনো ফাসিকও বলেননি। সবাই-তো হক্বের উপর আছে, কে কাকে না-হক্ব বলবে? আর বর্তমান আহলে হাদীসরা আমাদেরকে গোমরাহ বলছে! বেঈমান বলছে!! (নাউযুবিল্লাহ)

একবার হানাফী মাযহাবের এক বড়ো আলেম কোনো কাজে শাফিঈদের এলাকাতে গেলেন। মু‘আযযিন সাহেব তাকে দেখে ইক্বামাতের শব্দগুলো দুইবার করে বললেন। অথচ শাফিঈ মাযহাবের নিয়ম হলো, ইক্বামাতের শব্দগুলো একবার করে বলা। শুধু এতোটুকুই না, বরং তাকে ইমামতির জন্য আগে বাড়িয়ে দিলেন। জনাব! আপনি মেহমান, আপনি আমাদের ইমামতি করেন। আর উনিও আজীব রি‘আয়াত করেছেন। তিনি কিরা‘আত পড়তে গিয়ে বিসমিল্লাহ জোরে পড়লেন। অথচ হানাফী মাযহাবে বিসমিল্লাহ আস্তে পড়তে হয়। উনি চিন্তা করেছেন, যেহেতু পুরা এলাকার জনসাধারণ শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী, তাই তাদের মাঝে যেনো কোনো বিশৃঙ্খলা বা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি না হয়। কারণ শাফিঈ মাযহাবে বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার অংশ। আর ফাতিহা যেহেতু জোরে পড়তে হবে, সেহেতু বিসমিল্লাহও জোরে পড়তে হবে। এখানে হানাফী মাযহাবের ঐ আলেমের আচরণে কি কোনো সমস্যা হয়েছে?

খোদ ইমাম শাফিঈ রহ. যখনই ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কবর যিয়ারতের জন্য কুফা নগরীতে আসতেন, তখন ফজরের নামাযে কুনূত পড়তেন না।

লোকেরা আপত্তি করলো যে, হুযূর!! আপনার মাযহাব কোথায় গেলো? তিনি উত্তরে বললেন, আমার মাযহাব ঠিকই আছে, কিন্তু যে ইমামের উসূল নিয়ে আমরা চলি তার এলাকাতে এসে আমরা আমাদের মাযহাব কায়েম করাকে বেয়াদবি মনে করি। সুবাহানাল্লাহ!

শাখাগত মাস‘আলায় মত-পার্থক্য অতীতে কখনোই ফিতনার কারণ হয়নি; বরং পরস্পর এভাবেই মিল-মুহাব্বতের সাথে জীবন-যাপন করে আসছি।

তারা প্রশ্ন করতে পারে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানাতে কি তাকলীদ ছিলো? সাহাবীদের যামানাতে কি তাকলীদ ছিলো? এগুলো তারা জোর গলায় বলবে। আপনারা উত্তর দিবেন, হ্যাঁ। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানাতে তাকলীদ ছিলো। তার প্রমাণ হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় যতোগুলো এলাকা বিজিত হয়েছিলো সেগুলোর প্রতিটিতেই তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন করে গভর্নর পাঠিয়েছিলেন এবং প্রতি এলাকার অধিবাসীদেরকে তাদের নিজ নিজ এলাকায় নিযুক্ত গভর্নরকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা কখনোই বলেননি যে, সমস্যায় পড়লে মদীনায় এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারী যুবককে ইয়ামানে পাঠালেন। তার নাম হযরত মু‘আয ইবনে জাবাল, ফক্বীহুল আনসারী। পাঠানোর সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে ইয়ামানের গভর্নর করে পাঠাচ্ছি। তুমি ঐ এলাকার লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিবে এবং তারা তোমার কাছে মাস'আলা জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করবে। আমাকে বলো, তুমি তাদেরকে কীভাবে ফায়সালা দিবে? তিনি উত্তরে বললেন, আমি তাদেরকে কুরআন-এর মাধ্যমে ফায়সালা দিবো। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি কুরআনে না পাও? তিনি উত্তর দিলেন, তাহলে হাদীসের মাধ্যমে ফায়সালা দিবো। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, যদি হাদীসেও না পাও? তিনি বললেন, أجتهد برأيي আমি কুরআন-হাদীস থেকে ক্বিয়াস করে মাস'আলা বের করবো। তার এ উত্তর শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে গেলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله بالحق ‘সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি তার রাসূলের দূতকে সহীহ জিনিস বোঝার তাওফীক দান করেছেন’ (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২২০৬১)। এখন আমার প্রশ্ন হলো, ইয়ামানের লোকেরা কি এ সাহাবীকে অনুসরণ করেননি? আর এটা ‘মুতলাক তাকলীদ’ ছিলো, না ‘তাকলীদে শাখসী’ ছিলো? অবশ্যই এটা তাকলীদে শাখসী ছিলো অর্থাৎ, নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ ছিলো।

‘আমর ইবনে হাযম রাযি.কে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরান এলাকাতে পাঠিয়ে ঐ এলাকার লোকদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, তোমরা এ সাহাবীকে অনুসরণ করো (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ৩৫৯২)। এভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতো এলাকাতে গভর্নর পাঠিয়েছিলেন প্রত্যেক এলাকার লোকদেরকে বলে দিয়েছিলেন যে, তোমরা নিজ এলাকার গভর্নরকে অনুসরণ করো।

একবার বাহরাইন এলাকার কিছু লোক আরজ করলো যে, হুযূর!! আমাদেরকে একজন মু‘আল্লিম দিন, যিনি আমাদেরকে ইসলাম ও আপনার সুন্নাত শিক্ষা দিবেন। লক্ষ্য করুন! ‘হাদীস’-এর শব্দ হলো يعلمنا الإسلام وسنتك এখানে ‘হাদীস’ নয়, বরং ‘সুন্নাত’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ ‘হাদীস’ ও ‘সুন্নাত’ এক বিষয় নয়। (সময় পেলে পরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে ইনশা-আল্লাহ।) নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযি.-কে দিয়ে বললেন, একে নিয়ে যাও। সে এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো আমানতদার। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন, সে যা করে তোমরা তা-ই করো। আমার কাছে আসার কোনো দরকার নেই (মারাসিলে আবু দাউদ; হা.নং ২৫৭)। একেই বলে ‘তাকলীদে শাখসী’। একেবারে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অনুসরণ করা। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানা অতিক্রান্ত হলো। এরপর এলো খুলাফায়ে রাশেদীনের যামানা। খুলাফাদের পক্ষ থেকে প্রত্যেক শহরে একজন মুফতী অর্থাৎ ফক্বীহ সাহাবী নিযুক্ত করা হলো এবং ঐ শহরের লোকদেরকে হুকুম দেয়া হলো তারা যেনো নির্ধারিত মুফতী সাহাবীকে অবশ্যই অনুসরণ করে। সে মতে মক্কায় হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.কে, মদীনার হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি.কে এবং কুফায় হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.কে মুফতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিলো। এভাবে প্রত্যেকটি শহরে একজন মুফতী ছিলেন। আর ঐ এলাকার লোকেরা এমনভাবে তাকলীদে শাখসী করতেন যে, এক শহরের লোক অন্য শহরের মুফতীকে অনুসরণ করতেন না। তাদের মুফতী সাহেব যা বলতেন শুধু সে অনুযায়ী আমল করতেন।

একবার মদীনার একদল লোক মক্কায় হজ্জ করতে এলো। তাদের সব কাজ শেষ, শুধু বিদায়ী তাওয়াফ বাকী। এরই মধ্যে তারা একটি সমস্যায় পড়ে গেলো। তাওয়াফ শুরু করার পূর্বেই তাদের এক মহিলার মাসিক শুরু হয়েছে; এখন তারা কীভাবে দেশে ফিরবে? এক্ষেত্রে তাদের মুফতী সাহেবের ফাতাওয়া ছিলো, সে অপেক্ষা করবে এবং মাসিক শেষ হওয়ার পর বিদায়ী তাওয়াফ আদায় করবে। এ ফাতাওয়া অনুযায়ী তাদের দেশে ফিরা বিলম্বিত হয়ে যায়। তারা বিষয়টি নিয়ে মক্কার মুফতী হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর সাথে কথা বললেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, হুযূর! এখন আমাদের করণীয় কী? তিনি ফাতাওয়া দিলেন যে,

ঐ মহিলার বিদায়ী তাওয়াফ মাফ। তোমরা তাকে নিয়ে চলে যাও। তারা আপত্তি জানলো, হুযূর! আপনি-তো যেতে বলছেন, কিন্তু মদীনার মুফতী সাহেব-তো অনুমতি দেন না...। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৭৫৮)

এসব ঘটনা থেকেই বুঝা যায় যে, তারা তাকলীদে শাখসী তথা ব্যক্তি তাকলীদকে কতোটা গুরুত্ব দিতেন।

এই যে 'তাকলীদে শাখসী', এটা কি কোনো নির্দিষ্ট এলাকার সাথে খাস ছিলো? না। গোটা মুসলিম জাহানেই এর প্রচলন ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানা থেকে অদ্যাবধি প্রত্যেক যুগের উলামাগণ তাকলীদের উপর আমল করেছেন যার দ্বারা একথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, তাকলীদ ওয়াজিব। সুতরাং দ্বীনের উপর চলতে হলে চার মাযহাবের যেকোনো একটিকে অনুসরণ করা প্রত্যেকের জন্য জরুরী।

চার ইমাম নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালা, খুলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক নিয়োগ-প্রাপ্ত মুফতী সাহেবগণের ফাতাওয়া ও ফয়সালাগুলোকে সামনে রেখেই জীবনের সকল অধ্যায়ের সমাধান দিয়েছেন। এক কথায় চার ইমাম যখন ফায়সালা দিয়েছেন, তখন তাদের সামনে কুরআন, হাদীস, সাহাবা কিরামের ইজমা এবং মুফতী সাহাবা কিরামের ফায়সালাসমূহ লিখিত আকারে ছিলো। এগুলোর ভিত্তিতে তারা সম্ভাব্য মাস'আলাসমূহের একটা ফায়সালা দিয়ে গেছেন। ইমাম-তো আরো বেশি ছিলো। যেমন- ইমাম 'আওযাঈ' রহ., মালিক রহ.-এর সাথী ইমাম লাইছ ইবনে সা'দ রহ.-যিনি যোগ্যতায় ইমাম মালিক রহ.-এর চেয়ে কম ছিলেন না। ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন, ليث ليس أقل من مالك লাইছ, মালিকের চেয়ে কম যোগ্য নয় (সিয়ারু আ'লামিল নুবালা, ইমাম যাহাবি ৭/২১৬)।

সুতরাং তিনিও একজন ইমাম। কিন্তু এসকল ইমামের মাযহাব স্থায়ী হয়নি। কারণ পুরো জীবনব্যাপী যতো মাস'আলা দরকার সেগুলোর সববিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত দিয়ে যাননি। এজন্য তাদের মাযহাব কিছুদিন পর বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর যারা সর্ববিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন তাদের মাযহাবই স্থায়ী হয়েছে। এসবই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা! এখানে আমি হাদীস এবং বাস্তবসম্মত উদাহরণ দ্বারা মাযহাব ও তাকলীদকে আপনাদের সামনে স্পষ্ট করার চেষ্টা করলাম।

ফিক্বহ ও ফক্বীহ

হাদীসে শরীফে এসেছে, رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ (সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৬৬)। অন্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ (মুসনাদে হুমাইদী; হা.নং ৮৮)। আমার উম্মতের মধ্যে অনেকে মুহাদ্দিস হবে, কিন্তু তারা সকলে ফক্বীহ হবে না। গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য

করুন! এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেলো, সকল মুহাদ্দিস ফক্বীহ হবে না। কিন্তু যিনি ফক্বীহ তিনি অবশ্যই মুহাদ্দিস। উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজে বুঝে আসবে। যেমন: ‘কুতুবে সিত্তাহ’-এর সংকলকগণ কেউ ফক্বীহ ছিলেন না। তবে হ্যাঁ, সবাই মুহাদ্দিস ছিলেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, ইমাম বুখারী রহ. এতো মাস'আলা ইস্তিম্বাত করলেন, তাহলে তিনি কি ফক্বীহ নন? আমি বলবো যে, হ্যাঁ। তিনি ফক্বীহ। তবে তিনি فقيه من المحدثين। অর্থাৎ তিনি فقيه من الفقهاء ছিলেন না। তবে অন্যান্য মুহাদ্দিসীনের তুলনায় তার তবীয়তে ইস্তিম্বাত বেশী ছিলো। কিন্তু তাকে ইমাম আবু হানীফা রহ., ইমাম মালিক রহ.-এর মতো ইমামদের সাথে তুলনা করলে চলবে না। কারণ উভয় শ্রেণীর মাঝে রয়েছে আসমান-যমীন ফারাক। হযরত ইবনে তাইমিয়্যা রহ.ও অনেক বড়ো ফক্বীহ ছিলেন। তার ফাতাওয়ার কিতাবের নাম- مجموعة فتاوى ابن تيمية। কিন্তু থানভী রহ. ‘মাজালিসে হাকীমুল উম্মাহ’ নামক কিতাবের একস্থানে বলেছেন, তিনি ফক্বীহ ছিলেন ঠিক, কিন্তু তাকে অথবা ইমাম বুখারীকে যদি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সাথে তুলনা করা হয় তাহলে একজন মক্তবের ছাত্র এবং অপরজন শাইখুল হাদীস। এরপর থানভী রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ইস্তিম্বাত এবং তাদের ইস্তিম্বাতের স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা বোঝা গেলো যে, মুসলিম সমাজে ফক্বীহর প্রয়োজন রয়েছে। তাই প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফক্বীহ তৈরি করতে হবে; দারুল ইফতা খুলে হাদীস পড়ুয়া ছাত্রদের মুফতী হিসেবে তৈরী করতে হবে। এক হাদীসে এসেছে, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَالْفِقْهُ بِالتَّفَقُّهِ (আলমুজামুল কাবীর, তাবারানী; হা.নং ৯২৯) অর্থাৎ ‘ইলম বলা হয় যা উস্তাদের কাছ থেকে শেখা হয়। শুধু স্টাডি করার নাম ‘ইলম নয়। কাজেই আপনাকে মুতা‘আল্লিম হতে হবে। আর ফিক্বহ বলা হয়- একজন বিজ্ঞ ফক্বীহ-এর সুহবতে থেকে অর্জিত কুরআন-সুন্নাহর গভীর জ্ঞানকে। আপনারা ভালো করেই জানেন, সমুদ্রের দুটি স্তর। উপরের স্তর থেকে জেলেরা মাছ ধরে। আর তলদেশ থেকে ডুবুরীরা মণিমুক্তা আহরণ করে। তেমনি ‘ইলম একটি সমুদ্র। মুহাদ্দিসগণ উপরের স্তর থেকে হাদীসের জাহেরী অর্থ নিচ্ছেন। আর ফক্বীহগণ সমুদ্রের গভীর থেকে মাস'আলা-মাসাইল ইস্তিম্বাত করছেন।

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিক্বহের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে এর দ্বারা এও প্রমাণিত হলো যে, একা একা গবেষণা করলে তা ‘ইলম হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন, মওদুদীর গবেষণা ‘ইলম নয়। তেমনিভাবে, ডা. জাকির নায়েকের লেকচারও ‘ইলম নয়। কারণ তারা কোনো বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের সুহবত অর্জন করেনি। দুঃখের বিষয়, আজ ডাক্তার

দিচ্ছেন ফাতাওয়া, আর মওদুদী সাহেব প্রফেসরদের তাফসীর করতে বলেছেন। মা'আযাল্লাহ।

ওয়ারিস এর হাকীকত

অন্য হাদীস اَلْعُلَمَاءَ هُم وَرَثَةُ الأَنْبِيَاء (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ৩৬৪১) দ্বারা একথা বুঝা যায়, 'উলামারা নবীদের ওয়ারিস।' নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ারিস শব্দ কেনো ব্যবহার করলেন? এর সমার্থক অন্য কোনো শব্দও-তো বলতে পারতেন? যেমন- العلماء خلفاء الأنبياء। এটা বলার পিছনে হিকমত আছে। একটা হিকমত আগেই বলেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা রেখে গেছেন আমরা সবগুলোরই ওয়ারিস। শুধু মাদরাসায় পড়ালে হবে না। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি শুধু তা'লীম রেখে গেছেন? শুধু দা'ওয়াত রেখে গেছেন? নাকি শুধু তাযকিয়া রেখে গেছেন? বরং তিনি সবগুলোই রেখে গেছেন। সুতরাং ওয়ারিস হতে হলে সবগুলোকেই আকড়ে ধরতে হবে।

আরেকটি হিকমত হলো, দুনিয়াতে ওরাসাত দাবী করতে হলে বলতে হয় যে, আমি তার ছেলে বা আমি তার ভাতিজা ইত্যাদি। অর্থাৎ মিরাছ দাবী করতে গেলে নসবনামা বলতেই হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, যে কেউ আমার ওয়ারিস দাবী করবে তাকে নসবনামা বয়ান করতে হবে। সে কার কাছ থেকে শিখেছে? এবং তার পূর্বসূরী কে ছিলেন? এভাবে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সিলসিলা বয়ান করতে হবে। যে বয়ান করতে পারে সে-ই গ্রহণযোগ্য আলেম। অন্যদিকে, যে বয়ান করতে পারে না, সে কোনো আলেমই না। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতকে একটা দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। সুতরাং যে-ই বয়ান কিংবা তাফসীর করতে আসবে তাকে বলা হবে, আপনি আগে সনদ বয়ান করুন। আপনার উস্তাদ কে? তার উস্তাদ কে? এভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সিলসিলা বয়ান করুন। যদি সে বলতে না পারে তাহলে বুঝতে হবে লোকটি ভুঁইফোড়। 'ইলমি জগতে তার মা-বাপ নেই। সুতরাং তার বয়ান শুনা যাবে না। এটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা!

ফক্বীহ-এর গুরুত্ব ও আহলে হাদীসদের ভ্রষ্টতা

আমি অন্য যে হাদীসটি পড়েছিলাম [رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيه (মুসনাদে হুমাইদি; হা.নং ৮৮)] সে হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, সমাজে একজন ফক্বীহের গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ আহলুল হাদীসরা বলছে, এর কোনো প্রয়োজনই নেই। এ থেকেই বুঝা যায়, তারা একদিকে বুখারী শরীফ বোগলে রাখে; অপরদিকে সুযোগ পেলেই সহীহ হাদীসকেও অস্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিফাযত করুন। আমিন।

মোটকথা, ফক্বীহ লাগবেই। অন্যথায় পুরা সমাজব্যবস্থা অচল হয়ে পড়বে। আপনারা সুলাইমান আল আ'মাশ রহ.-এর ঘটনা জানেন। তার কাছে একলোক এসে ফাতাওয়া চাইলে আ'মাশ রহ. আবু হানীফা রহ.-এর বিশিষ্ট শাগরেদ আবু ইউসুফকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, তাকে জিজ্ঞেস করো। আবু ইউসূফ রহ. তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়ে দিলেন। আ'মাশ রহ. জিজ্ঞেস করলেন, বাবা! তুমি কোন হাদীসের ভিত্তিতে উত্তর দিলে? আবু ইউসূফ রহ. বললেন, উস্তাদজী! আপনি গতকাল যে হাদীসটি বলেছিলেন, ঐ হাদীসেই-তো এ বিষয়টির সমাধান রয়ে গেছে। আ'মাশ রহ. দেখলেন যে, আসলেই বিষয়টি তা-ই। তিনি স্বীকার করে নিলেন এবং সাথে এ স্বীকৃতিও দিলেন যে, أنتم الأطباء ونحن الصيادلة 'তোমরা ফক্বীহগণ হলে ডাক্তার, আর আমরা মুহাদ্দিসরা হলাম ঔষধ বিক্রেতা। হাদীসের মধ্যে কী মাস'আলা আছে আমরা সেগুলো বের করতে পারি না।' (মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা,ইমাম যাহাবী ১/৩৫)

আরেকজন মুহাদ্দিসের ঘটনা। তিনি ইমাম বুখারী রহ.-এর উস্তাদ। নাম ইয়াযিদ ইবনে হারুন। তিনি এক মাজলিসে বসা। সেখানে আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, 'আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর মতো বড়ো বড়ো আলিমও উপস্থিত ছিলেন। ইতোমধ্যে একব্যক্তি এসে ফাতাওয়া জিজ্ঞাসা করলে ইয়াযিদ ইবনে হারুন রহ. ধমক দিয়ে বললেন, আমাদের কাছে কেনো এসেছো? আহলুল 'ইলমের কাছে যাও। তারা তোমাদেরকে এর সমাধান বলে দিবে। আমরা-তো আহলুল হাদীস। তখন 'আলী ইবনুল মাদীনী বললেন, হুযূর!! আপনার কাছে বসা এ সকল বড়ো বড়ো আলেমরা কি আহলে 'ইলম নয়? তিনি বললেন, তোমরা কোথায় আহলে 'ইলম, তোমরা হলে আহলুল হাদীস; হাদীস বিশারদ। মনে রাখবেন! এটা ঢাকার বংশালের আহলে হাদীস না যে, হাদীসের কিছুই জানে না, কিন্তু দাবী করে আমরা হাদীস বিশারদ। আরে ভাই! আহলুল হাদীস তো ঐ ব্যক্তি যে লক্ষ লক্ষ হাদীস জানে; হাদীসের জরাহ-তাদীল ও সহীহ-যঈফ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখে। ইমাম বুখারী রহ. আহলুল হাদীস। তাই বলে বংশালের সুইপার, ঝাড়ুদার, রিকশাওয়ালা সবাই কি আহলুল হাদীস হয়ে যাবে?

যা-হোক, ইয়াযীদ ইবনে হারূন বললেন, তুমি আবু হানীফা রহ.-এর শাগরেদদের কাছে যাও। তারাই আহলুল 'ইলম, তারাই ফাতাওয়া দিবে। কারণ তারা ফক্বীহ ও মুজতাহিদ। যিনি এতো বড়ো মুহাদ্দিস, আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের মতো জগৎবিখ্যাত আলেমদ্বয়ের উস্তাদ; তিনি ফাতাওয়া দিচ্ছেন না। ফাতাওয়া দেয়ার জন্য পাঠাচ্ছেন আবু ইউসুফ রহ.-এর কাছে। তাহলে মুফতীর দরকার আছে কিনা? স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সব মুহাদ্দিস ফক্বীহ হয় না, ফক্বীহ আলাদাভাবে তৈরি করো। কিন্তু আহলে হাদীসরা বলছে যে, মুফতীর দরকার নেই। তাহলে তারা কি হাদীস মানে,

না হাদীস অস্বীকার করে? আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, প্রত্যেক ফক্বীহ মুহাদ্দিস, কিন্তু প্রত্যেক মুহাদ্দিস ফক্বীহ নহে।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেলো যে, ফক্বীহ ও মুহাদ্দিসের মাঝে পার্থক্য আছে এবং এটিও প্রমাণিত হলো যে, ফক্বীহের মাকাম অনেক উপরে। হাজার মুহাদ্দিসীনের মধ্যে ২/৪ জন ফক্বীহ হয়। বিশেষ করে যারা উলূমুল হাদীসের ছাত্র তারা পড়েছে যে, যদি দুই রাবীর রিওয়ায়াতের মাঝে মতভেদ হয়, আর তাদের একজন ফক্বীহ এবং অপরজন শুধু মুহাদ্দিস; তাহলে ফক্বীহের রিওয়ায়াত প্রাধান্য পাবে। কারণ মুহাদ্দিসগণ কখনো কখনো মতনের মধ্যে বেশি-কম করে ফেলেন। যে কারণে রিওয়ায়াতের মধ্যে ইখতিলাফ হয়ে যায়।

হাদীসের কিতাবসমূহে যতো রাবী রয়েছেন তারা সবাই কী ফক্বীহ? কখনোই না। এজন্যই তাদের বর্ণনায় এতো গরমিল। খোদ বুখারী শরীফের মতনের মধ্যেও অনেক ভুল আছে। যদিও সনদ সহীহ। আমি যখন বুখারী শরীফ পড়াই তখন ছাত্রদেরকে ভুলগুলো ধরিয়ে দেই। বুখারীর এক রিওয়ায়াতে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কূফাতে ১৪ দিন ছিলেন। কিন্তু এটা ভুল। আসলে তিনি ২৬ দিন ছিলেন। এখানে সনদ সহীহ, মতন ভুল। আরেক রিওয়ায়াতে আছে, যখন ‘শাম দেশ’ থেকে আবু সুফিয়ানের মৃত্যুর খবর এলো... এটা ভুল। আবু সুফিয়ানের মৃত্যুর খবর আসেনি, বরং তার ছেলের মৃত্যুর খবর এসেছে। এরপর যুল ইয়াদাইনের হাদীস বুখারীর এক জায়গাতে আছে إحدى صلاة العشاء যার অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মাগরিব বা ইশার নামাযে ভুল করলেন। এটা সঠিক নয়, বরং হবে إحدى صلاة العشي যার অর্থ যুহর বা আসর। এরকম বহু জায়গাতে মতনে ভুল আছে। এমনকি বুখারী রহ. নিজেও এক জায়গায় সনদ বয়ান করতে গিয়ে ভুল করেছেন। লিখেছেন, ‘আব্দুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহাইনা। অথচ বুহাইনা তার মায়ের নাম। তিনি ভুল করে দাদা বানিয়ে দিয়েছেন। তাই বুখারীকে তারা যেভাবে বড়ো করে দেখায় সেটা ঠিক না। হ্যাঁ! এটা ঠিক আছে যে, সব হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে এটা তুলনামূলক বেশী সহীহ। এর অর্থ এই নয় যে, বুখারীর মধ্যে কোনো ভুলই নেই। এছাড়া, বুখারীতে প্রচুর পরিমাণে মানসূখ হাদীস রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ‘কিতাবুল গোসল’-এ একটি হাদীস নিয়ে এসেছেন, যেখানে বর্ণিত হয়েছে : সহবাস হয়েছে, কিন্তু বীর্যপাত হয়নি; এমন অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু উযূ করতে বলেছেন (হা.নং ২৯২)। অথচ অন্য হাদীসে আছে, إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ হযরত আয়িশা রাযি. বলেন, فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاغْتَسَلْنَا (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৬০৮) তাহলে এ হাদীস বুখারীতে আসলো কোত্থেকে? সহীহ বুখারীর আরেক স্থানে আছে, وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ (হা.নং ৬৮৮) ‘কোনো কারণে যদি তোমাদের ইমাম

বসে বসে নামায পড়ে, তাহলে তোমরাও বসে ইক্তিদা করো।' অথচ এটা কি এখন জায়েয আছে? ইমাম বুখারী রহ. এ হাদীসটি ছয়বার এনেছেন, অথচ সব মানসূখ। কারণ, মরযে ওয়াফাতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার যোহরের নামায বসে পড়িয়েছিলেন। কিন্তু কোনো সাহাবী বসে ইক্তিদা করেননি। এতে বুঝা যায়, এ হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে। এরপর কিতাবুল জানায়িযেও বুখারী রহ. ৬টি স্থানে একটি মানসূখ হাদীস এনেছেন, তোমরা যদি কোনো লাশ যেতে দেখো, দাঁড়িয়ে যাও। (হা.নং ১৩০৭-১৩১২)

অথচ অন্য রিওয়ায়েত এসেছে,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَةِ, ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ, وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ

'ইসলামের শুরুর যামানাতে আমাদেরকে দাঁড়াতে বলা হয়েছিলো, কিন্তু পরে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে'। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে আগের হাদীসটি মানসূখ।

এখন আমরা আহলে হাদীসদেরকে বলবো, যে কেউ আহলে হাদীস দাবী করবে তাকে ১১টি বিয়ে করতে হবে। আর যতো মানসূখ হাদীস আছে, সবগুলোর উপর আমল করতে হবে। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সমস্যার কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২২৪) তাই বলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা কি সুন্নাত? আহলে হাদীসরা বলবে সুন্নাত। এক আহলে হাদীস এ কথা বলেছেও! অতঃএর তার এ ফাতাওয়া শুনে একজন মুসল্লী প্রশ্ন করেছে, হুযূর!! এটা পুরুষদের জন্য না মহিলাদের জন্য! একথা শুনে আহলে হাদীস আলেম লা-জওয়াব!!

একবার নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাতনী (হযরত যয়নাবের মেয়ে) কে কাঁধে করে নামায পড়েছেন (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫১৬)। তারা কি নাতনী কাঁধে করে নামায পড়ে? হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোহর ছাড়া বিবাহ করেছেন। কিন্তু তারা কি মোহর ছাড়া বিবাহ করে? কোথায় তারা হাদীস মানে? আসলে এসবই তাদের ধোঁকাবাজী।

হাদীস ও সুন্নাহ-বিভ্রান্ত আহলে হাদীস সম্প্রদায়

একইভাবে হাদীস ও সুন্নাতের মাঝেও পার্থক্য রয়েছে। হাদীসের কিতাবে যা আছে সব হাদীস। কিন্তু সবগুলো সুন্নাত না। এখান থেকে বাছাই করে দেখতে হবে, যেগুলোর মধ্যে সুন্নাত হওয়ার ৪ শর্ত পাওয়া যায় সেগুলো সুন্নাত এবং হাদীস। আর যেগুলোর মধ্যে শর্তসমূহ পাওয়া যায় না সেগুলো হাদীস বটে, কিন্তু সুন্নাত না। শর্ত চারটি হলো-

১. যেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে লক্ষ্য করে বলেছেন।

২. যা মানসূখ বা রহিত হয়নি।

৩. যেটা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা অন্যকোনো ব্যক্তি বা জায়গার সাথে খাস না।

বি.দ্র. ব্যক্তির সাথে খাস। যেমন- مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَحَسْبُهُ (আলমুজামুল কাবীর, তাবারানী; হা.নং ৩৭৩০)। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুযাইমাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, কারো সাক্ষীর ব্যাপারে সে একাই যথেষ্ট।

আরেক সাহাবীর ঘটনা। তিনি বকরী তাকসীম শেষে দেখলেন একটি মাত্র বকরী বাকি আছে। কিন্তু সেটার বয়স এক বছরও হয়নি যে, সেটি দিয়ে কুরবানী হয়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিয়ে বললেন, এটি শুধুমাত্র তোমার জন্য। অন্য কারো জন্য জায়েয হবে না (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৫৪৭)। এটা তো তার জন্য খাস। তাহলে কি এ হাদীস সুন্নাত হবে? না, এটা শুধু হাদীস থাকবে?

৪. যেটা বয়ানে জাওয়াযের জন্য বলা হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি নবুওয়াতী দায়িত্ব ছিলো যেটা জায়েয সেটা একবার হলেও আমল করে দেখানো। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, তিনি রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন, রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করেছেন, নাতনীকে কাঁধে করে নামায পড়েছেন ইত্যাদি। এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য হলো, ‘এগুলোও বৈধ’ একথা বর্ণনা করা। তাই বলে এগুলোকে সুন্নাত বলা যাবে?

সুতরাং উপরিউক্ত ৪টি শর্ত পাওয়া গেলেই কোনো হাদীসকে সুন্নাত বলা যাবে। এজন্যই নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কোথাও হাদীস মানতে বলেননি। বরং সকল স্থানে সুন্নাত মানতে বলেছেন। কয়েকটি নমুনা দেখুন-

١. المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. المعجم الأوسط لأبي القاسم الطبراني ٥/٣١٥(٥٤١٤)

٢. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. الموطأ بروايتين (٣٣٣٨)

٣. من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدى فإن له من الأجر مثل من عمل بها. سنن الترمذى لمحمد الترمذى ٢٦٧٧

٤. من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. سنن الترمذى لمحمد الترمذى ٢٦٧٨

٥. من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. سنن الترمذى لمحمد الترمذى ٢٥٢

٦. ستة لعنتهم لعنهم الله ... والتارك لسنتي. سنن الترمذى لمحمد الترمذى ٢١٥٤

٧. تمسك بسنة خير من إحداث بدعة. مسند أحمد بن حنبل - ١٠٥/٤ (١٦٩٧٠)

٨. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته. صحيح مسلم ٨٠

٩. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سنن أبي داود ٤٦٠٧

١٠. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. سنن ابن ماجة ٤٢

উপরে মাত্র কয়েকটি দলীল উল্লেখ করলাম। সবগুলোতেই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত শব্দ ব্যবহার করেছেন। ভুলেও তিনি হাদীস শব্দ ব্যবহার করেননি। হাদীসতো রিওয়ায়াত করতে হবে। অতঃপর দেখতে হবে সেটা মানসূখ কিনা, গ্রহণযোগ্য কিনা, বয়ানে জাওয়াযের জন্য কিনা, জাল কিনা ইত্যাদি। তারপর সেটি আমলযোগ্য হওয়া না হওয়ার মাস'আলা। এছাড়া, যেখানে আমলের প্রশ্ন এসেছে, সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ‘সুন্নাত’ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

একস্থানে গোমরাহ ফিরকা সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়েও নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘হাদীস’ শব্দ প্রয়োগ করেছেন, يأتونكم من الأحاديث (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৭) এখানে ‘হাদীস’ শব্দের বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। দেখুন গোমরাহ ফিরকার জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘হাদীস’ শব্দ ব্যবহার করলেন। এখন বলেন, আহলে হাদীস নাম রাখা কি জায়েয আছে? তাহলে সহীহ নাম কী হবে? সহীহ নাম হবে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ। এখানে ‘ওয়াও’ অর্থ مع। আর জামা‘আতের অর্থ জামা‘আতুস সাহাবা। সাহাবা কিরামের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের কথা অনুযায়ী আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে মানি। এজন্যই যারা হাদীসের কিতাব রচনা করেছেন, তারা নিজেদের কিতাবের নামে ‘হাদীস’ শব্দ ব্যবহার করেননি, বরং সুন্নাত শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন: سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن ابن

سنن النسائي، ماجه অর্থাৎ সকলেই ‘سنن’ শব্দ ব্যবহার করলেন। কারণ তারা জানতেন, আমল করতে হবে একমাত্র সুন্নাতের উপর, অন্যকিছুর উপর নয়।

আপনারা উসূলে ফিক্বহের যতো কিতাব পড়বেন সবখানেই পাবেন যে, শরী‘আতের দলীল ৪টি। কিতাবুল্লাহ, সুন্নাত, ইজমা ও ক্বিয়াস। অথচ আহলে হাদীসরা ইজমা-ক্বিয়াস মানেই না। আমি আগেই বলে এসেছি যে, ইজমা-ক্বিয়াসকে না মানার দরুন তারা সূরা মায়িদার ৩নং আয়াত اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ-কে অস্বীকার করেছে। কারণ নব-উদ্ভাবিত হাজারো সমস্যা যেগুলো সরাসরি কুরআন-হাদীসে নেই; সেগুলোকে ইজমা-ক্বিয়াস দ্বারা ফয়সালা করা হয়েছে।

ইজমা মানার দলীল কি কুরআনে নেই? আল্লাহ বলেছেন, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ (সূরা নিসা; আয়াত ১১৫)। ইমাম শাফিই রহ. চারবার কুরআন খতম করেছেন শুধু ‘ইজমা’র দলীল বের করার জন্য। আমরা-তো সহজেই বলে দিলাম, আর আপনারাও এক মিনিটেই দলীল পেয়ে গেলেন! আর ক্বিয়াসের দলীল হলো فاعتبروا يا أولى الألباب। সুতরাং তাকলীদ করতে হবে, ফক্বীহকে মানতে হবে, ইজমা-ক্বিয়াস মানতে হবে, এ ব্যাপারে কি সন্দেহ করার কোনোও অবকাশ আছে?

ইজমা-ক্বিয়াস উভয়টি একত্রে মানতে হবে। এর দলীল- أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (সূরা নিসা; আয়াত ৫৯) তোমরা আল্লাহকে মানো এটা কুরআন; নবীজীকে মানো এটা সুন্নাত; উলিল আমর এটা ইজমা; এবং ফাইন তানাযা’তুম এটা ক্বিয়াস-এর দলীল। সুবাহানাল্লাহ!

শেষকথা

এখন আমি সংক্ষেপে আপনাদেরকে দুটো পয়েন্ট বলবো, যে দুটোর মাধ্যমে আপনারা সহজেই আহলে হাদীসদের ফিতনাকে মুকাবিলা করতে পারবেন, ইনশা-আল্লাহ।

১.প্রত্যেক মাদরাসায় উলূমুল হাদীস বিভাগ খুলে ছাত্রদেরকে উলূমুল হাদীস পড়িয়ে দিতে হবে। যেহেতু আহলে হাদীস একটি ঈমান বিধ্বংসী ফিতনাতে রূপ নিচ্ছে, তাই প্রত্যেক মাদরাসায় উলূমুল হাদীস বিভাগ খোলা ফরজে কিফায়া। যখন আমাদের সন্তানদেরকে উলূমুল হাদীস পড়িয়ে দেয়া হবে, তখন তারা টর্চ লাইট হাতে তথাকথিত আহলে হাদীস খোঁজে বের করে তাদেরকে উচিত শিক্ষা দিবে, ইনশা-আল্লাহ।

২.আপনারা প্রতি মসজিদে আমার লেখা ‘হাদীসে রাসূল’ ও ‘তুহফাতুল হাদীস’ কিতাব দুটি প্রচার করুন। যে মাস‘আলাগুলো নিয়ে তারা বাড়াবাড়ি করে আর বলে, ‘তোমাদের কোনো দলীল নেই, তোমাদের ইমাম সাহেব ক্বিয়াস করেছেন’, সেখানে এসবের দলীলগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো হাদীস সম্পর্কে তাদের অভিযোগ থাকলে সেটার জবাবও দেয়া হয়েছে। তারা তারীখে ইবনে খাল্লাদূনের হাওয়ালায় বলে, তোমাদের ইমাম সাহেব মাত্র ১৭টি হাদীস জানতেন। অথচ এটি একটি ডাহা মিথ্যা কথা। শুধু এর সাহায্যেও বুঝা যায় তাদের মূর্খতা কত নিম্নপর্যায়ের অন্তর্গত। আপনারা কিতাবটি খুললেই দেখতে পাবেন সেখানে স্পষ্টাক্ষরে লিখা আছে, ‘আবু হানীফা রহ.এর ১৭টি হাদীসের ‘দেওয়ান’ ছিলো। ‘দেওয়ান’ অর্থ কিতাব। তাহলে ১৭টা হাদীস আর ১৭টা কিতাব কি এক কথা? এটাতো পাগলের প্রলাপ বৈ কিছু নয়।

তারা যেমন পাবলিককে শিখিয়ে দেয়, উচ্চস্বরে ‘আমীন’ বলতে হবে। আমরাও মুসল্লিদেরকে বুঝিয়ে দিবো, ‘আমীন’ আস্তে বলতে হবে। এই যে দেখুন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর দলীল। উপরিউক্ত দুটো কাজ-

১. প্রত্যেক মাদরাসায় ‘উলূমুল হাদীস’ বিভাগ খোলা।

২. আমার কিতাব দুটির ব্যাপক প্রচার করা।

তাহলে সাধারণ মানুষও আহলে হাদীসের মুকাবিলা করতে পারবে ইনশা-আল্লাহ এবং তাদের ফিতনার ব্যাপারে সকলে সজাগ থাকতে পারবে।

এসব বিষয় আপনারা মনে রাখবেন এবং প্রচার করবেন। কারণ আহলে হাদীসের ফিতনা প্রতিরোধ করা আমাদেরই দায়িত্ব। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

বয়ান-৪

২৯ অক্টোবর ২০১৫ খ্রি. রোজ বৃহস্পতিবার, লা-মাযহাবীদের সৃষ্ট ফিতনার বিরুদ্ধে কক্সবাজার জেলা ইমাম পরিষদ-এর উদ্যোগে কক্সবাজার লালদিঘীর পাড় ময়দানে (হোটেল পালংকি-সংলগ্ন মাঠ) এক গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এ সমাবেশে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ছিলেন ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী ‘আব্দুর রহমান সাহেব রহ.। সমাবেশে যোগদানের একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বার্ধক্যজনিত শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতির এক পর্যায়ে হযরত অচেতন হয়ে পড়েন। মাঝে সামান্য সময়ের জন্য চেতনা ফিরে পেলে নিজের পরিবর্তে স্নেহভাজন মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. (মুহিউসসুন্নাহ শাহ আবরারুল হক রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা

জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া-এর প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস)কে উক্ত সমাবেশে বয়ানের নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত ফক্বীহুল মিল্লাতের অন্তিম মূহুর্তের নির্দেশ পালনার্থে হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. উল্লিখিত সমাবেশে আহলে হাদীসের ফিতনার বিরুদ্ধে দীর্ঘ দেড় ঘন্টাব্যাপী নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ বয়ানটি পেশ করেন।

হামদ ও সালাতের পর। সম্মানিত উপস্থিতি!

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী ‘আব্দুর রহমান সাহেব (বর্তমানে রহ.)-এর দিলের তামান্না ও আবেগ ছিলো তিনি নিজেই আপনাদের সম্মেলনে আসবেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ থাকায় আমাকে আদেশ করেছেন। হয়তো সে আবেগের কারণেই আল্লাহ তা‘আলা আমাকে আপনাদের সামনে হাজির হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। নতুবা আমি এর ‘আহাল’ নই।

পূর্বকথা

আজকে আমাকে আহলে হাদীস বিষয়ে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। এ ফিরকার জন্ম মূলত ইংরেজদের পিরিয়ডে। যখন উলামায়ে দেওবন্দ ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফাতাওয়া দিয়েছেন তখন এরা মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবীর নেতৃত্বে ইংরেজদের পক্ষে ফাতাওয়া দিয়েছে যে, ‘ইংরেজরা আল্লাহর রহমত, ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হারাম’! সে সময় তাদের নাম ছিলো মুহাম্মাদী, গাইরে মুকাল্লিদ বা লা-মাযহাবী অর্থাৎ তারা চার মাযহাবের কোনো মাযহাব মানে না। অথচ তাবেঈদের যামানা থেকেই এ চারটা মাযহাব চালু আছে এবং দুনিয়ার সমস্ত উলামাদের ‘ইজমা’ হয়ে গেছে যে, আল্লাহকে পেতে হলে, মুক্তি পেতে হলে কোনোব্যক্তি যে এলাকায় আছে তাকে ঐ এলাকার প্রচলিত মাযহাব মতো জীবন-যাপন করতে হবে।

যেহেতু আমাদের বাংলাদেশের সকল মুফতী হানাফী মাযহাবের, তাই আমাদেরকে হানাফী মাযহাব অনুসরণ করতে হবে। এখানে অন্যকোনো মাযহাব মানলে চলবে না। মালয়েশিয়ার সকল মুফতী শাফিঈ মাযহাবের, তাই সেখানকার লোকদের শাফিঈ মাযহাব অনুসরণ করতে হবে। লোহিত সাগরের ওপারে আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, তিউনেসিয়া, মরক্কো ইত্যাদি দেশে মালেকী মাযহাবের মুফতীগণ রয়েছেন। তাই সেসব দেশে যারা বসবাস করেন তাদেরকে মালেকী মাযহাব মানতে হবে। আরব ভূখন্ডে আছেন হাম্বলী মাযহাবের মুফতীগণ। সুতরাং সেখানে যারা আছেন তারা হাম্বলি মাযহাব মেনে চলবেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হায়াতে প্রত্যেক এলাকার লোকদেরকে ঐ এলাকার ‘গভর্ণর সাহাবী’কে অনুসরণ করতে বলা হয়েছিলো। যেমন, ইয়ামানবাসীদেরকে মু‘আয ইবনে জাবাল রাযি.কে অনুসরণ করতে বলা হয়েছিলো। তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে

প্রত্যেকটা শহরে একজন করে মুফতী সাহাবী বসিয়ে দেয়া হয়েছিলো। যেমন, মক্কায় আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি., মদীনায় যায়েদ বিন সাবিত রাযি. প্রমুখ সাহাবীগণ। তারা সারাজীবন ফাতাওয়া-ফারায়েজ দিয়ে গেছেন। তাদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব ছিলো। সেগুলো পরে কয়েকজন মুজতাহিদ ইমাম এক জায়গায় জমা করেন। এতে দেখা গেলো দশ-বারোটা মাযহাব হয়ে গেছে। দশ-বারোটা থেকে আল্লাহর মঞ্জুর হিসেবে রয়ে গেলো চারটা। অন্যগুলো বাদ গেলো কীভাবে? অন্য মাযহাবগুলো অবশ্যই সঠিক ছিলো এবং সংশ্লিষ্ট ইমামদের জীবদ্দশায় তাদের মাযহাব অনুযায়ী চলার অনেক লোকও ছিলো। কিন্তু তারা যে কিতাব লিখে গেছেন হাদীস ও কুরআনের আলোকে এতে জীবনের সব সমস্যার সমাধান ছিলো না। কারো কিতাবে আট আনা সমাধান আছে, কারো কিতাবে চৌদ্দ আনা সমাধান আছে। এ কারণে ঐ মাযহাবগুলো অটোমেটিক বাদ হয়ে গেলো। তাদের অনুসারী যারা ছিলো তারা যখন তাদের ইমামের পক্ষ থেকে সকল বিষয়ের সমাধান পেলো না তখন তালাশ করলো কোন ইমামের মাযহাবে ষোলআনা সমাধান আছে। এভাবে তালাশ করে যে মাযহাবে সমাধান পেলো তারা ঐ মাযহাবে চলে গেলো। ফলে বারোটা থেকে কমতে কমতে আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী চারটা মাযহাব টিকলো। চার মাযহাবের চারজন ইমাম জীবনের শুরু থেকে কাফন-দাফন পর্যন্ত প্রায় সব বিষয়ের সমাধান কুরআন-হাদীসের আলোকে বিস্তারিত লিখে দিয়ে গেছেন।

মাযহাবীদের ঐক্য বনাম লা-মাযহাবীদের ফিতনা

আমরা চার মাযহাবের সকলেই মিলে-মিশে আছি। আমাদের কেউ একে অপরের কোনো সমালোচনা করে না। কোনো হানাফীকে দেখবেন না কোনো শাফিঈ'র বিরুদ্ধে বলছে। আবার কোনো শাফিঈকে দেখবেন না হানাফীদের বিরুদ্ধে বলছে। তেরোশ বছরের মধ্যে কোথাও কোনো ঝগড়া হয়নি। কোথাও শুনবেন না যে, এক মাযহাবের অনুসারী অন্য মাযহাবের অনুসারীকে বলছে, তোমার-তো নামায হয় না! তোমার নামায-তো হাদীসের সঙ্গে মেলে না, বা তোমরা ইমাম মেনে বেঈমান হয়ে গেছো! এমন কোনো নজীর নেই। আমাদের চার মাযহাবের মাসআলার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। কিন্তু ঈমানের ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই। এক্ষেত্রে চার মাযহাবই এক। আমীন আস্তে বলবে, না জোরে বলবে? হাত নাভীর নিচে বাঁধবে, না বুকের উপরে? এ জাতীয় কিছু মাসআলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ মাযহাবের দলীল রয়েছে। কিন্তু কোথাও আপনি ঝগড়া দেখবেন না। হাদীসের কিতাবে অন্য মাযহাবের যে দলীলগুলো রয়েছে আহলে হাদীসরা তা সাধারণ মানুষের সামনে পেশ করে বলে যে, এই দেখো হাদীসে এভাবে রয়েছে, অথচ তোমার নামায হাদীস অনুযায়ী হয়নি। সুতরাং তোমার নামায হয়নি! এছাড়াও হাদীসের কিতাবে অনেক হাদীস এমন রয়েছে যা রহিত হয়ে গেছে, যার উপর আমল করা নিষেধ। কিন্তু লা-মাযহাবীরা

সেগুলো জনগণের সামনে পেশ করে তাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। যেগুলো রহিত হয়ে গেছে সেগুলো কি হাদীসের কিতাবে আছে, না বের করে দেয়া হয়েছে? উলামায়ে কিরাম জানেন যে, সেগুলো হাদীসের কিতাবে এখনও আছে। অন্যথায় ইসলামের ইতিহাসে কখন কী ঘটেছিলো সে ইতিহাস আমাদের অজানা রয়ে যেতো। যেমন :

* এক সময় নামাযে কথা বলা যেতো, এখন বলা যায় না। অথচ সে হাদীস এখনো কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫৪০, সুনানে নাসাঈ; হা.নং ১১৮৮)

* যিলহজ্জ মাসের এগারো-বারো তারিখে রোজা রাখার কথা বুখারী শরীফে আছে। যা এক সময় বৈধ ছিলো, পরে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯৯৬)

* এক সময় ঘোড়ার গোশত খাওয়া জায়েয ছিলো, কিন্তু এখন মাকরূহ। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪২১৯, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৭৯০)

* আগুনে পাকানো কিছু খেলে একসময় উযূ ভেঙ্গে যেতো, এখন তা হয় না। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৩৫১, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৭৬০৫)

* স্ত্রীর কাছে গেছে, সব কিছু হয়েছে, কিন্তু বীর্যপাত হয়নি; বুখারীতে আছে গোসল ফরজ হয়নি! অথচ নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী নির্দেশ -'দুইজনের খাতনার স্থান একসাথে হলে গোসল ফরজ হয়ে যায়'-দ্বারা পূর্বেরটা তথা বুখারী শরীফের হাদীসটা রহিত হয়ে গেছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৭৯, ২৯৩, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৩৪৯)

এমন অসংখ্য রহিত হাদীস কিতাবে বিদ্যমান আছে। এখন এ লোকগুলো সেই রহিত হাদীস এনে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়, আর বলে যে, 'তোমরা-তো এই হাদীসের উপর আমল করো না!' তাহলে আপনারাই বলুন, বিষয়টি কেমন হবে? এসকল হাদীসের উপর আমল করা কি জায়েয আছে?

আবার, এমন কিছু হাদীস আছে যা নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাস। উম্মতের জন্য এর উপর আমল করা জায়েয নয়। তারা এগুলো এনে ফিতনা করছে। লোকদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। আমাদের লোকেরা কি আলেম-উলামাদের বয়ান শোনে না? নাকি যার যার মতো আমল করে? আলেমরা-তো সহীহ কথাই বলছেন। তারা কি হাদীস বোঝেন না? এ যুগে হাদীস পড়ায় কারা? হানাফী উলামাগণ, না গায়রে মুকাল্লিদরা?

তাদের এক নাম গায়রে মুকাল্লিদ, আরেক নাম মুহাম্মাদী। আরেক নাম হলো আহলে হাদীস। তারা একেক সময় একেক নাম ব্যবহার করে। 'আহলে হাদীস' নামটা আগে ছিলো না। এটা তারা বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে পাশ করিয়ে

নিয়েছিলো। আমার লেখা ‘মাযহাব ও তাকলীদ’ নামক বইতে তাদের নাম পাশ করানোর বিস্তারিত ইতিহাস আমি লিখেছি (পৃ. ১৫৯)। মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন করেছিলো : ‘আমরা আপনাদের পক্ষে কাজ করতে চাই, কিন্তু পারছি না। লোকেরা আমাদের কাছে ভিড়ছে না। আমাদের নামটা আহলে হাদীস পাশ করিয়ে দেয়া হোক। তাহলে জনগণ আমাদেরকে অনুসরণ করবে।’

সুতরাং আপনারা স্পষ্টই বুঝতে পারছেন যে, আহলে হাদীস ইংরেজের লোক, এরা মুসলমানদের লোক নয়। এদের কাজই হলো ফিতনা করা। তারা আমাদের নামায অশুদ্ধ দাবী করে, আমাদের ইমাম আবূ হানীফা রহ.কে গালমন্দ করে এবং তারা বলে যে, মাযহাব মানা শিরক! আমরা কি ইমাম আবূ হানীফাকে খোদা বা নবী মানি? তাহলে শিরক হয় কীভাবে? শরী‘আতের জটিল বিষয়গুলো আমরা নিজেরা ব্যাখ্যা না করে ইমামদের ব্যাখ্যা মানি। কারণ তারা আগের যুগের লোক ছিলেন। তাই তারা মূল-এর বেশি কাছাকাছি ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. প্রায় দশজন সাহাবীর সংশ্রব পেয়েছিলেন। শরী‘আতের জটিল বিষয়গুলো তিনি সমাধান করে দিয়ে গেছেন। আমরা-তো সব বিষয়ে তাদেরকে ইমাম মানি না। যেমন- নামায পাঁচ ওয়াক্ত, রমাযানের রোযা ত্রিশটি। এক্ষেত্রে ইমাম মানার প্রয়োজন নেই। ধনী হলে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। এখানেও ইমাম মানার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কিছু জটিল মাসআলা আছে যেগুলোর সমাধান করা আপনার-আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি-আমি সমাধান করতে গেলে এক্সিডেন্ট করবো। শুধু এ ধরনের মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে মাযহাবের ইমামদের অনুসরণ করা হয়। এই মাযহাবগুলো স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলার ‘মানশা’ অনুযায়ী সৃষ্টি হয়েছে এবং সারা দুনিয়ার মুসলমানরা আনন্দ-চিত্তে মিলে-মিশে চার মাযহাব-এর একটি অনুসরণ করে আসছে। কিন্তু আহলে হাদীসদের জন্মলাভের পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ শুরু হয়। একই মসজিদে দু‘টি জামা‘আত হচ্ছে, যারা আমীন আস্তে বলে তারা আগে জামা‘আত করে, আর যারা জোরে আমীন বলে তারা পরে আরেকটি জামা‘আত করে। এক গ্রুপ নিচ তলায় নামায পড়ে,আরেক গ্রুপ উপর তলায়! এগুলো মুসলমানদের কাজ নয়। আমাদের কিছু ভাই বলতে শুরু করেছেন যে, ‘তারা-তো আর কাফির নয়, তারপরও আমাদের হুযূররা এদের বিরুদ্ধে কেনো সেমিনার ডাকেন?’ আমাদের এ লোকগুলো সাদাসিধা মানুষ। একারণে তারা বোঝে না যে, আহলে হাদীসের সাথে মতবিরোধ শুধু আমীন জোরে বলা, আর আস্তে বলা নিয়ে নয়, বারবার হাত উঠানো আর না উঠানো নিয়ে নয়। কেননা এগুলো-তো অন্য মাযহাবেও আছে। তাদের সাথে আমাদের মূল দ্বন্দ্ব হলো, ‘শরী‘আতের যে চারটি দলীল রয়েছে - তথা কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস, যেগুলো ছাড়া ইসলাম পরিপূর্ণ হতে পারে না এবং অসংখ্য মাস’আলার সমাধান সম্ভব হবে না- এ চার দলীল কুরআন

দ্বারাই প্রমাণিত; অথচ তারা ইজমা ও ক্বিয়াস এ দুটিই মানে না বা অস্বীকার করে। ইমামদের ইজমা ও জটিল মাস'আলায় তারা যে ক্বিয়াস করেছেন সেগুলো লা-মাযহাবীরা অস্বীকার করে। যেমন- হিরোইন সেবন করা জায়েয নাকি নাজায়েয তা কুরআন-হাদীসে নেই। এখন আমাদের কাছে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, হিরোইন খাওয়া জায়েয আছে কি না? তখন আমরা দেখবো যে, মদের ভিতর যে ক্ষতি রয়েছে হুবহু সে ক্ষতি হিরোইনেও রয়েছে। তাই আমরা বলবো, এটা হারাম। অথচ একথাটি কুরআন-হাদীসে কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। শুধু মদের ক্ষতির দিকগুলো হিরোইনের মধ্যে পাওয়া যাওয়ার কারণে এ হুকুম প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। এটাকেই ক্বিয়াস বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা নিজেই ক্বিয়াস করার হুকুম দিয়েছেন-

فاعتبروا يا أولى الأبصار، (سورة الحشر : ٢)

এর চেয়ে আরো স্পষ্ট কথা হাদীসে এসেছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি.কে ইয়ামানের গভর্নর হিসেবে পাঠানোর পূর্বে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে মু'আয! তুমি মানুষের মাঝে কীভাবে ফায়সালা করবে?' (মদীনা থেকে ইয়ামান দূরে হওয়ায় সব ফায়সালার জন্য মদীনায় আসা সম্ভব নয়।) তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'কুরআন থেকে ফায়সালা করবো।' 'কুরআনে না পেলে কী করবে?' 'আমি আপনার হাদীসের মধ্যে, সুন্নাহর মধ্যে তালাশ করবো।' 'হাদীস বা সুন্নাহয় না পেলে তখন কী করবে?' মু'আয ইবনে জাবাল বললেন, أجتهد برأئي তখন আমি ক্বিয়াস করবো।' অর্থাৎ এটা কুরআন-হাদীসে নেই, কিন্তু অনুরূপ আছে। অনুরূপ বের করে সেটা দিয়ে ফায়সালা দিবো। একথা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ করলেন, না খুশী হলেন? খুশী হলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله بالحق

অর্থঃ 'সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি তার রাসূলের দূতকে সত্য পৌঁছার তাওফীক দান করেছেন'। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২২০০৭)

অর্থাৎ ক্বিয়াস করার কথা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশী হয়ে গেলেন। এমন অনেক ক্বিয়াস নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হয়েছে। কিন্তু তিনি-তো বলেননি যে, 'এটা শিরক! এটা শরী'আতের দলীল নয়!!'

এছাড়া হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হায়াতে সাহাবা কিরাম কি ক্বিয়াস করেননি? করেছেন। যেমন-

দুইজন সাহাবী এক সফরে গিয়েছেন। নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু পানি পাচ্ছিলেন না। উভয়েই তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিলেন। নামায পড়া শেষ,

এবার পানি পাওয়া গেলো। কে বা কারা পানি নিয়ে এলো। একজন সাহাবী পানি পাওয়ার কারণে উযূ করে দ্বিতীয়বার নামায পড়লেন। অন্যজন পড়লেন না। অন্যজন বললেন, 'নামায-তো একবার পড়ে ফেলেছি, আমার ফরয-তো আদায় হয়ে গেছে'। তিনি পানি পাওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার নামায পড়লেন না। সফর থেকে ফিরে এসে উভয় সাহাবী নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ রিপোর্ট পেশ করলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সাহাবীকে যিনি দ্বিতীয়বার নামায পড়েননি- বললেন, أصبت السنة অর্থাৎ তুমি সুন্নাত অনুযায়ী আমল করেছো। পড়েই যখন ফেলেছো, আর পড়ার দরকার নেই। কিন্তু পড়ার আগে যদি পানি পাওয়া যেতো বা পড়ার মাঝখানে পাওয়া যেতো তাহলে তোমাকে উযূ করতে হতো। পড়ার পরে যেহেতু পেয়েছো, এখন আর দরকার নেই। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৩৮) নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সাপোর্ট করলেন। আর অপরজনকে বললেন, 'তোমার কাজটি সঠিক হয়নি। ভবিষ্যতে খেয়াল রাখবে।'

এভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মাস'আলা বলে দিলেন। কিন্তু এ কথা বললেন না যে, তোমরা ক্বিয়াস করলে কেনো? ক্বিয়াস করা-তো শিরক! আমরা সকলেই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি।

ইজমা-ক্বিয়াসের পরিচয় ও আহলে হাদীসের অবস্থান

শরী'আতের চার দলীলের প্রথম দলীল কুরআন এবং দ্বিতীয় দলীল সুন্নাহ। আর তিন নম্বর দলীল হলো ইমামদের ঐকমত্য। এটাকে বলে إجماع (ইজমা)। ইজমার একটি উদাহরণ : আপনি আপনার এক ছেলের জন্য অসিয়াত করে গেছেন। বলুন! জায়েয হবে? আপনার ছেলে-তো মীরাছ পাবে। শরী'আত অনুযায়ী পিতা থেকে তার ছেলেমেয়েরা নির্দিষ্ট হারে মীরাছ পেয়ে থাকে। এরপরও আপনি আলাদা করে এক ছেলেকে কিছু দিয়ে গেলেন কেনো? মীরাছের বাইরে কিছু দেয়াটাকে বলে 'অসিয়াত'। ওয়ারিশদের জন্য এ অসিয়াত হারাম। এটা কিসের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে? এটা 'ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। চার ইমামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি থেকে যে ওয়ারিশ মীরাছ পাবে, তার জন্য আলাদা অসিয়াত করা যাবে না।

শরী'আতের চার নম্বর দলীল হলো 'ক্বিয়াস'। এমন কোনো বিষয়, যে বিষয়ে কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়নি, সেটা ইমামগণ ক্বিয়াস করে বের করেন। যেমন, আমি মদের উপরে ক্বিয়াস করে হিরোইনের ফয়সালা উল্লেখ করলাম। সেটাকে বলে ক্বিয়াস। যেকোনো বিষয়েই-তো দলীল লাগবে। বিদায় হজ্জে আরাফার দিন নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয়েছে-

اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا

অর্থঃ আমি আজকের দিনে তোমাদের জন্য ইসলামকে, আমার দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম...। (সূরা মায়িদা; আয়াত ৩)

কোনো মাস'আলা কি এমন আছে, শরী'আতে যার উত্তর নেই? অথবা কিয়ামত পর্যন্ত কি এমন কোনো মাস'আলার উদ্ভাবন হতে পারে, যার কোনো উত্তর নেই? কতো কিছু কিয়ামত পর্যন্ত নতুন আবিষ্কৃত হবে? বীমা হয়েছে। শেয়ারবাজার হয়েছে। মাল্টিলেভেল মার্কেটিং হয়েছে। উলামায়ে কিরাম কি এগুলির জায়েয বা নাজায়েয হওয়ার ফাতাওয়া দিচ্ছেন না? এগুলো নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিলো না। তাহলে বর্তমান সময়ের উলামাগণ কোত্থেকে ফাতাওয়া দেন? ক্বিয়াস থেকে দেন, যা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় কি টেলিভিশন ছিলো? উলামায়ে কিরাম টেলিভিশনে অনুষ্ঠান উপভোগ করা হারাম বলেন। কিসের ভিত্তিতে? ক্বিয়াস করে। কুরআনে এমন কথা আছে, যার দ্বারা এটা হারাম হওয়া ক্লিয়ার বোঝা যায়। যেমন : একজন মহিলাকে বাস্তবে দেখা হারাম। তার ছবি দেখাও হারাম। এসব কি নেই টেলিভিশনে? আছে। গান-বাদ্য হারাম। টেলিভিশনে নেই? বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতা হারাম। এগুলো কি টেলিভিশনে নেই? এসবের ভিত্তিতে টেলিভিশন হারাম বলা হয়।

আহলে হাদীস ভাইয়েরা শরী'আতের চার দলীলের দুই দলীল (ইজমা ও ক্বিয়াস) মানে না। বুঝতে পারছেন সমস্যাটা কোথায়?

ফক্বীহ বা ইমাম বিষয়ে আহলে হাদীসদের অবস্থান

উম্মতের উলামাদের কর্মভিত্তিক বিভিন্ন নাম আছে। এক গ্রুপ উলামার নাম হলো 'ক্বারী'। আরেক গ্রুপ উলামার নাম হলো হাফেজ। এভাবে মাওলানা, মুহাদ্দিস, মুফতী প্রভৃতি বিভিন্ন নাম আছে। এরকম আরেক গ্রুপ উলামার নাম হলো 'ফক্বীহ'। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, আমাদের জন্য ফক্বীহ বা ইমাম লাগবে।

আপনারা কক্সবাজারের লোক, আপনারা সাগর পাড়ের লোক। আপনারা দেখছেন, এ সাগর থেকে দুই প্রকার লোক ফায়দা উঠায়। এক প্রকার লোক হলো 'জেলে'। তারা উপর থেকে মাছ ধরে আনে। ঠিক কি-না? নাকি তারা পানির তলদেশে চলে যায়? আরেক গ্রুপ লোক আছে, তারা বিশেষ পোশাক পরে অক্সিজেন সাথে নিয়ে সাগরের তলদেশে চলে যায়। সেখানে গিয়ে মনি-মুক্তা নিয়ে আসে। সাগর একটাই। কিন্তু কেউ উপকার নিচ্ছে উপর থেকে, আর কেউ উপকার নিচ্ছে তলদেশ থেকে। কুরআন-হাদীস তো একটা। এক গ্রুপ বহস করছে উপরেরটা নিয়ে, তাদেরকে বলা হয় 'মুহাদ্দিস'। আর যাদের জ্ঞান আরো তীক্ষ্ম, আরো গভীর, তারা কুরআন-হাদীসের একদম গভীরে চলে যায়। সেখানে গিয়ে মনি-

মুক্তা নিয়ে আসে অর্থাৎ জটিল মাস'আলা সেখান থেকে 'হল' করে নিয়ে আসে। তাদের নাম কী? তাদের নাম 'ফক্বীহ', যার বহুবচন 'ফুক্বাহা'। আমাদের ইমাম আবূ হানীফা রহ., উনি সর্বোচ্চ মানের একজন ফক্বীহ ছিলেন। উনি যে চল্লিশজন শাগরিদ তৈরী করেছেন-আল্লাহু আকবার- একেকজন 'ইলমের সাগর! তারা সকলেই ছিলেন ফক্বীহ। অবশ্য আমরা তাদেরকে 'ইমাম' বলে নামকরণ করে থাকি। 'ফক্বীহ আবূ হানীফা' বলা হয় না। বলা হয়, 'ইমাম আবূ হানীফা রহ.'। উনার একনম্বর শাগরিদ হলেন ইমাম আবূ ইউসূফ রহ.।

আমাদের কিছু ভাই-যারা লা-মাযহাবী তথা আহলে হাদীস, তারা বলছেন : এই ফক্বীহদের দরকার নেই। কারণ তাদের অনুসরণ করা শিরক! অথচ হাদীসের মধ্যে এক রিওয়ায়াতে এসেছে, رب حامل فقه غير فقيه

অর্থঃ অনেক মুহাদ্দিস আছে, যারা ফক্বীহ নয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ২৩০)

তারা 'হামেলে ফিক্বহ' অর্থাৎ তারা ফিক্বহ বহন করে, কিন্তু ফিক্বহকে হাদীস থেকে বের করতে পারে না। তাদেরকে 'হামেলে ফিক্বহ' বলা হচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই বলা হচ্ছে যে, তারা ফক্বীহ নয়।

আরেক জায়গায় আছে, رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه

অর্থঃ কিছু মুহাদ্দিস আছে, যারা মুহাদ্দিস বটে। কিন্তু সে এমন ব্যক্তির কাছে হাদীস পৌঁছায়, যে ব্যক্তি তার চেয়ে অনেক বেশী ফক্বীহ, অনেক বেশী 'ইস্তিম্বাত' করবে। (আবূ দাউদ; হা.নং ৩৬৬০, তিরমিযী; হা.নং ২৬৫৬)

এসব হাদীসের মধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথাটি বলেছেন তা হলো, সব মুহাদ্দিস ফক্বীহ না। হাঁ! মুহাদ্দিসদের মধ্যে একটি গ্রুপ আছে যারা ফক্বীহ। এ হাদীস দ্বারা আরেকটি কথা বোঝা যায়, যা বুঝার জন্য একটু ভূমিকা শুনুন!

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতো খবর দিয়ে গেছেন, ঐ সব খবর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 'অর্ডার'। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো খবর শুধু খবর না। যেমন : তিনি খবর দিয়েছেন, তালিবে 'ইলমের জন্য ফিরিশতারা নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেয়। এটা কি খবর, না অর্ডার? এটা কি শুধু সংবাদ দেয়া যে, তালিবে 'ইলমের জন্য ফিরিশতারা পাখা বিছিয়ে দেয়? আমি একটু আগে দাবী করলাম যে, এটা কোনো খবর উদ্দেশ্য না, উদ্দেশ্য হলো অর্ডার। অর্থাৎ একথা হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন শুধু সংবাদ দেয়ার জন্য নয়। বরং একথা বোঝানোর জন্য যে, তোমরা তালিবুল 'ইলম হও। একটা প্রচ্ছন্ন অর্ডার আছে এ কথার মধ্যে। ঠিক এখানে যে বললেন, সকল মুহাদ্দিস, ফক্বীহ হবে না...। এখানেও-তো অর্ডার আছে। সে অর্ডার হলো :

তোমরা ফক্বীহ তৈরী করো। বিভিন্ন মাদরাসাতে দারুল ইফতা চালু করে মুফতী বসাও, মুফতী বানাও!

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা দ্বারা বোঝা গেলো যে, মুহাদ্দিস যথেষ্ট নয়। ফক্বীহ লাগবে। অর্থাৎ জেলে যথেষ্ট না; ডুবুরীও লাগবে।

আর আহলে হাদীসরা বলছে যে, কোনো ফক্বীহ লাগবে না। তাহলে কী করতে হবে? ‘প্রত্যেককে একটি বাংলা বুখারী বগলে রাখতে হবে!!’

আরে! প্রত্যেকেই কি হাদীস বোঝার যোগ্যতা রাখে? হাদীসের তরজমা পড়েই কী আমল করা যায়?

ইমাম মানা জরুরী

আমি এমন অনেক হাদীস পেশ করতে পারবো যে, সাহাবীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের শাব্দিক অর্থের উপর আমল করেননি। হাদীসের সরাসরি যে অর্থ তার উপর আমল করেননি এবং আমল না করাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারায হননি। বরং আরো খুশী হয়েছেন। কারণ তারা হাদীসের শব্দ না দেখে হুযূরের উদ্দেশ্য কী, সেটা বোঝার চেষ্টা করেছেন। আহলে হাদীসরা শব্দ দেখে আমল করে। অন্তর্নিহিত কারণ কী, সেটা দেখে না! বুঝে না, বুঝার চেষ্টাও করে না। বরং বলা যায়, বুঝার যোগ্যতাই রাখে না।

সময় স্বল্পতার কারণে আমি দু’তিনটা হাদীস পেশ করছি, যেগুলোর দ্বারা আপনারা বুঝতে পারবেন যে, শুধু শব্দ দেখে আমল করলে হবে না।

১. হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় কাফিররা সন্ধি করতে রাজি হচ্ছিলো না এ কারণে যে, আপনার নামের সাথে ‘রাসূলুল্লাহ’ লেখা হয়েছে কেনো? তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আপনাকে যদি ‘রাসূলুল্লাহ’ই মেনে নেই, তাহলে আপনাকে বাইতুল্লাহতে ঢুকতে দিতে অসুবিধা কী? ঝগড়া-তো এ জায়গায়ই। সুতরাং এটা বাদ দেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তো উম্মী ছিলেন, উনি লিখতে পারতেন না। তিনি হযরত ‘আলী রাযি. কে বললেন যে, সুলাহনামা থেকে ‘রাসূলুল্লাহ’ শব্দটি কেটে দাও। হযরত ‘আলী রাযি. পরিষ্কার বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! ওরা আপনাকে রাসূলুল্লাহ মানুক আর না-ই মানুক, সন্ধি হোক বা না হোক, এটা ঠিক থাকবে’। উনি কাটলেন না। ফলে সুলাহও আটকে গেলো। অবশেষে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকজন সাহাবীকে দিয়ে ‘রাসূলুল্লাহ’ শব্দটি কাটিয়ে দিলেন। কাজ আগে বাড়লো। পুরা ঘটনা বলার সময় হবে না। আমি একটু একটু বলবো বোঝার জন্য। এই যে হযরত ‘আলী রাযি. ‘রাসুলুল্লাহ’ শব্দটি কাটলেন না, এতে কী নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারায হয়ে গেলেন? হযরত ‘আলী রাযি. অর্ডার মানেননি তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নারায হয়েছেন? প্রকৃতপক্ষে

তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, হযরত 'আলীর ঈমানী গায়রত, ঈমানী শক্তির কারণে তা পারছেন না। তাই নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশী হয়ে গেলেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪২৫১)

২. নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একলোক সম্পর্কে রিপোর্ট এলো যে, অমুক লোক অমুক বাঁদীর সাথে মেলামেশা করে। কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণও খাড়া হয়ে গেলো, যা বাস্তবে সঠিক ছিলো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তো গায়েব জানেন না। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সে লোকটিকে কতল করার অর্ডার দিয়ে হযরত 'আলী রাযি.কে দায়িত্ব দিলেন। হযরত 'আলী রাযি. ঐ লোকের এলাকায় গেলেন। গিয়ে দেখেন যে, সে এক কুয়ার মধ্যে শরীর ঠান্ডা করছে। হযরত 'আলী রাযি. অর্ডার করলেন, উঠো। সে হাত বাড়িয়ে দিলো এবং বললো, আমি-তো একা উঠতে পারবো না, হাত ধরে উঠাও। হযরত 'আলী রাযি. হাত বাড়িয়ে দিলেন। সে সময় ঐ বেচারার পরনে কিছু ছিলো না। হযরত 'আলী রাযি.-এর নযর পড়লো ঐ ব্যক্তির সতরের উপর। তখন তিনি লক্ষ্য করলেন, তার পুরুষাঙ্গ নেই, ছোটোকাল থেকেই কাটা। তিনি চিন্তা করলেন, তার দ্বারা- তো যিনা করা সম্ভব নয়। তখন 'আলী রাযি. ফিরে আসলেন এবং বললেন, হুযূর! আপনি-তো আমাকে হত্যা করতে পাঠিয়েছেন, কিন্তু সে-তো পুরুষাঙ্গহীন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ঠিক করেছো, হয়তো সাক্ষীরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে'। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৭৭১)

এই যে 'আলী রাযি. নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম মানলেন না; তার উপর হুকুম ছিলো লোকটির কাছে গিয়েই তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার, সেখানে গর্দান না উড়িয়ে চলে আসলেন; নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি রাগ করেছেন? 'আলী রাযি. হুযূরের কথা বাহ্যিকভাবে অমান্য করেছেন, অথচ নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশী হয়েছেন।

৩. এক মহিলাকে বেত্রাঘাত করার জন্য হযরত 'আলী রাযি.কে পাঠানো হলো। সে মহিলা যিনা করেছে। হযরত 'আলী রাযি. সেখানে গিয়ে খবর পেলেন যে, সে মহিলা দুই-একদিন আগে সন্তান প্রসব করেছে। খুবই দুর্বল। তখন বেত্রাঘাত না করে ফিরে আসলেন। এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রিপোর্ট দিলেন যে, সে মহিলা সন্তান প্রসব করার কারণে খুবই দুর্বল। বেত্রাঘাত করলে হয়তো মারা যাবে। সুস্থ হওয়ার পর বেত্রাঘাত করা হোক। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে পছন্দ করলেন। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৭০৫)

পাঠালেন বেত মারার জন্য, কিন্তু 'আলী রাযি. বেত না মেরেই চলে আসলেন। তারপরও-তো নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ করলেন না। সুতরাং বুঝা গেলো যে, শুধু হাদীসের শব্দ বুঝলেই চলবে না, মর্ম বুঝতে হবে। এখানে

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার আসল উদ্দেশ্য কী, তা বুঝতে হবে। এর কোনো ব্যাখ্যা আছে কি-না জানতে হবে। আর তা জানার জন্য চার মাযহাবের ইমাম লাগবে। সুতরাং ইমাম মানা শিরক নয়, বরং জরুরী।

সাহাবীদের অনুসরণ বিষয়ে আহলে হাদীসের অবস্থান

আমরা বলি, ‘নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কিরাম হক্বের উপর ছিলেন’। কিন্তু কোনো কোনো বাতিল ফিরকা এ কথাটা মানে না।

যেমন- শি’আ একটি বাতিল দল। তারা বলে, ‘নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর পাঁচজন সাহাবী ছাড়া সব সাহাবা মুরতাদ হয়ে গেছে’! নাউযুবিল্লাহ।

আরেক দল আছে মওদুদী সাহেবের অনুসারী। তারা বলে যে, ‘নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাদে আর কাউকে হক্বের মাপকাঠি মানা যাবে না!’

তাহলে কি তারা সাহাবা কিরামকে মানলো? লক্ষ্য করুন! শি‘আদের যে রোগ, মওদুদী সাহেবের অনুসারীদের একই রোগে পেয়েছে।

বর্তমানে আহলে হাদীসদেরও একই অভিমত যে, ‘নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর সাহাবারা হক্বের উপর টিকে ছিলেন না। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শিখিয়ে গেছেন তারাবীহ আট রাকা‘আত পড়ার জন্য। কিন্তু তারা উমর রাযি.-এর নেতৃত্বে বিশ রাকা‘আত চালু করে দিলো! এভাবে তারা গোমরাহ হয়ে গেলো’!! নাউযুবিল্লাহ।

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নাকি আট রাকা‘আত তারাবীহ শিখিয়ে গিয়েছিলেন! আট রাকা‘আতের দলীল কোথায়? ‘তারাবীহ আট রাকা‘আত হওয়ার কোনো দলীল আছে কি?

আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়াতে চারটা মাযহাব চালু করেছেন। কোনো মাযহাবে কি তারাবীহ আট রাকা‘আত আছে? আহলে হাদীসরা তাহাজ্জুদের দলীল নিয়ে লাগিয়েছে তারাবীহর মধ্যে। হযরত আয়িশা রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, ‘নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাত্রের নফল নামায কতো রাকা‘আত ছিলো’? তিনি বললেন, ‘নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানে এবং রমাযানের বাহিরে আট রাকা‘আতের বেশী রাত্রের নফল পড়তেন না’। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১১৪৭) যখন রমাযানের বাহিরের কথা আয়িশা রাযি. বলছেন, তখন এর দ্বারা কি আপনারা বুঝছেন না যে, এটা তারাবীহর আলোচনা নয়? কারণ, তারাবীহ রমাযানের বাহিরে পড়া যায় না। এ হাদীসটা তাহাজ্জুদের দলীল। কিন্তু তারা তাহাজ্জুদের হাদীসকে তারাবীহ-এর স্থলে লাগিয়ে সব সাহাবায়ে কিরামকে পথভ্রষ্ট প্রমাণ করছে যে, তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা’লীম

ঠিক রাখে নাই। তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, তারাবীহ আট রাকা’আত, আর তারা বলছে, ‘তারাবীহ বিশ রাকা’আত’। তাহলে কি সব সাহাবা রাযি. গোমরাহ হয়ে গেছেন? (বলুন- নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক!)

তারা দলীল দেয়ার চেষ্টা করে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন একসাথে তিন তালাকে এক তালাক হয়। আর সাহাবা রাযি. বলছেন, একসাথে তিন তালাকে তিন তালাক হয়। এখানেও তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা রাখে নাই। অর্থাৎ কথা না রেখে তারা গোমরাহ হয়ে গেছে’! (বলুন-নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)!!

আহলে হাদীসদের সত্যিকার পরিচয়

আহলে হাদীসদেরকে আপনারা জিজ্ঞাসা করুন, ‘তোমরা কি বুখারী মানো’? কী বলবে তারা? মানে। বুখারীতে লেখা আছে, ‘একসাথে তিন তালাকে তিন তালাক’। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫২৫৯) তোমরা বলছো, ‘বুখারী মানো’। তাহলে এ হাদীস মানতেছো না কেনো? এবার আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলেন, তাদের সাথে আমাদের ঝগড়াগুলো কোথায়? মনে রাখুন, তারা বলে-

১. ইজমা-ক্বিয়াস কিছু লাগবে না।

২. ফক্বীহ লাগবে না। (নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফক্বীহ লাগবে।)

৩. ‘সাহাবীরা সত্যের মাপকাঠি না’। (নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, ‘আমার সমস্ত সাহাবী সত্যের মাপকাঠি’।)

৪. আমরা যারা ইমাম মানি, তারা সবাই মুশরিক। (নাউযুবিল্লাহ!)

এসব মারাত্মক ভুলের অনুসারী হওয়ার কারণে উলামাগণ তাদের মুখোশ উন্মোচন করতে বাধ্য হচ্ছেন। দুনিয়ার সাড়ে ১৫ আনা মুসলমান অর্থাৎ সারা দুনিয়ার মুসলমান মাযহাবী। তারা হাতেগোনা কয়েকটা মানুষ লা-মাযহাবী হয়ে আমাদেরকে বলছে মুশরিক। সারা দুনিয়ার মানুষ বেঈমান হয়ে গেলো, আর অল্প কয়েকজন লা-মাযহাবী মাত্র ঈমানদার রয়ে গেলো! এখানে উল্লেখ্য যে, যদি কোনো মুসলমানকে বেঈমান বলা হয়, আর প্রকৃতপক্ষে সে বেঈমান না হয়, তাহলে যে এ ধরনের কথা বলে সে বেঈমান হয়।

তারা বুখারী ও মুসলিম-এর হাদীস মানে। বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ প্রমুখ ব্যক্তিগণ মাযহাব মেনেছেন কি-না? বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ এ চারজন শাফিঈ ছিলেন। নাসাঈ, আবূ দাউদ হাম্বলী ছিলেন। সাহাবীদের পরে চার ইমামের যুগ। চার ইমামের পরে সিহাহ সিত্তার মুসান্নিফদের যুগ। তারা সবাই মাযহাব মেনেছেন। ইমাম আহমাদ রহ. ইমাম বুখারীর সরাসরি উস্তাদ ছিলেন।

তারা কেউ একথা বলেননি যে, মাযহাব মানার প্রয়োজন নেই; আমার কিতাব বগলে রাখো, আর তা দেখে দেখে আমল করো!!

আমার একটা কিতাব আছে, 'মাযহাব ও তাকলীদ'। সেখানে আমি দেখিয়েছি যে, আজ পর্যন্ত যারা হাদীস জমা করেছেন তাদের কে কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন; আজ পর্যন্ত যারা তাফসীরের কিতাব লিখেছেন তারা কে কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং যে কিতাব দিয়ে হাদীসকে সহীহ-যঈফ বলা হয় সে কিতাবগুলো কারা লিখেছেন।

ফাতাওয়ার কিতাবগুলো কারা লিখেছেন? মাযহাবীরা লিখেছেন। কুরআনে কারীমের যতো প্রসিদ্ধ তাফসীর-গ্রন্থ আছে সেগুলোর সবই মাযহাবী উলামাগণ লিখেছেন। উপমহাদেশে বৃটিশদের আগমনের পূর্বে আহলে হাদীসের কোনো কিতাবই পাবেন না। তখন-তো আহলে হাদীস গোষ্ঠিই ছিলো না। এরা ভুঁইফোড় গোষ্ঠি!

বিভিন্ন কিতাব রচয়িতাদের সবাই-তো মাযহাবী ছিলেন। তারা যদি সবাই মুশরিক হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা বুখারী শরীফ দিয়ে দলীল দিচ্ছো কেনো? তবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ কিতাবে আল্লামা সুবকী লিখেছেন যে, ইমাম বুখারী শাফিঈ মাযহাবের ছিলেন। (তবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ ১/৪২১) মাযহাব মানলে যদি কেউ বেঈমান হয়ে থাকে, তাহলে ইমাম বুখারী বেঈমান হয়ে গেছেন। কাজেই বেঈমানের কিতাব দিয়ে তোমরা দলীল দিচ্ছো কেনো?

এমনিভাবে, নুখবাতুল ফিক্বার, মুকাদ্দামায়ে ইবনে সালাহ-সহ উসূলে হাদীস ও তারাজীমের যেসব কিতাবের সাহায্যে হাদীস সহীহ না যঈফ নির্ণয় করা হয়- সেগুলোর লেখক-তো মাযহাবী ছিলেন। মাযহাব মানা যদি শিরক হয়ে থাকে, তাহলে মুশরিকের কিতাব দিয়ে হাদীস সহীহ না যঈফ তা সাব্যস্ত করছো কেনো?

এবার আসুন, এ লোকগুলো যে এতোগুলো অন্যায় করলো অর্থাৎ-

১. তারা ইজমা-ক্বিয়াস মানে না।

২. নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ফক্বীহ লাগবে। তারা বলে ফক্বীহ লাগবে না।

৩. নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাহাবীগণ সত্যের মাপকাঠি। তারা বলে, সাহাবীরা সত্যের মাপকাঠি না।

৪. নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মু'মিনের ব্যাপারে সু-ধারণা রাখতে এবং কাফির না বলতে। অথচ তারা সবাইকে মুশরিক বলছে।

৫. তারা সুন্নী মুসলমানদের মিত্র নয়। (ব্যাখ্যা সামনে আসছে।)

এবার বলুন, এ লোকগুলোর ব্যাপারে কি হুযূররা চুপ থাকবে, নাকি তাদের মুখোশ খুলে দিবে, যাতে তারা আপনাদের সবাইকে বেঈমান বানিয়ে ফেলতে না পারে?

দয়া করে আরেকটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আমেরিকা যদি কোনো দেশে বোমা মারতে চায় সরাসরি তা পারে না, বরং ঐ দেশের কিছু লোকের সাপোর্ট লাগে। কুড়াল ততোক্ষণ লাকড়ি কাটতে পারে না, যতোক্ষণ তার মধ্যে লাকড়ি না ঢুকানো হয়। আমেরিকা একা কিছু করতে পারে না, আক্রান্ত দেশের কিছুলোকের সাহায্য তার নিতে হয়। তা না হলে মুসলমানদের এতোগুলি দেশ কাফিররা ধ্বংস করলো কীভাবে? ইরাকে যারা শী'আ আছে তারা আমেরিকার সাথে যোগ দিয়েছিলো। বিভিন্ন দেশে এটা শুরু হয়ে গেছে। যে সকল মুসলিম দেশে বিভিন্ন খনি আছে আমেরিকা সেসব দেশকে পদানত করে খনিগুলো লুণ্ঠন করে। প্রত্যেকক্ষেত্রে দেখা গেছে, আমেরিকা সুন্নী মুসলমানদেরকে আপন করে না। তারা হয় শী'আদেরকে আপন বানিয়ে সুন্নীদেরকে মারে, অথবা কোনো কোনো দেশে আহলে হাদীসদেরকে আপন বানিয়ে সুন্নীদেরকে মারে। এতে পরিস্কার বোঝা গেলো, এরা মুসলমানদের মধ্য থেকে কেউ নয়। আমেরিকা আমাকে আপনাকে বিশ্বাস করে না, বরং তাদেরকে বিশ্বাস করে। আল্লাহ না করুন, বাংলাদেশকে যদি আমেরিকা ধ্বংস করতে চায় তাহলে অস্ত্র, টাকা ইত্যাদি কাকে দেবে? আপনাকে, না এদেরকে? (কাজেই গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার যে, বর্তমানে বাংলাদেশে আহলে হাদীসদের দৌরাত্মের মূলে কী আছে?)

তারা আপনাকে আমাকে মারবে এই বলে যে, এরা কাফির; এদেরকে মারতে হবে। সুতরাং, তারা আমেরিকার বন্ধু। আমেরিকা তাদেরকে মসজিদে গিয়ে আমীন জোরে বলার জন্য পাঠিয়েছে। আমি-তো ঢাকায় বিভিন্ন মসজিদে বলে দিয়েছি, আপনারা ছোটো করে একটা সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিন যে, এ মসজিদে সবাই আস্তে আমীন বলে। এখানে চিৎকার করে আমীন বলে বিভ্রান্তি ছড়ানোর সুযোগ নেই। যদি কেউ এ দলের হয়ে থাকেন তিনি যেনো এ মসজিদে না ঢুকেন। মোহাম্মদপুরে একটি মসজিদ আছে। আল আমীন মসজিদ। সেখানে চিৎকার করে আমীন বলার চর্চা আছে। আপনারা বলবেন, তোমারা সে মসজিদে চলে যাও। যতো পারো সেখানে গিয়ে চিৎকার করো এবং দু-পা যতো ফাঁকা করে পারো দাঁড়িয়ে নামায পড়ো, কোনো অসুবিধা নেই।

দু'পায়ের মাঝে এতো বিশাল ফাঁকা রেখে নামাযের কথা কোন হাদীসে এসেছে? কখনো শুনেছেন এরকম হাদীস? এদের সম্পর্কেই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ، وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّونَكُمْ، وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ

অর্থঃ শেষ যামানায় কিছু ধোঁকাবাজ-মিথ্যুক প্রকাশ পাবে, যারা তোমাদেরকে এমন এমন হাদীস শোনাবে যা তোমরা ইতোপূর্বে কখনো শোননি, এমনকি তোমাদের পূর্বপুরুষ বাপ-দাদাও শোনেনি। তাদের ব্যাপারে সাবধান থেকো। তাদের কথিত হাদীস যেনো তোমাদের গোমরাহ করতে না পারে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৭)

রুকূ-সিজদায় ঘোড়ার লেজের মতো হাত তোলা বা নামাযে দু'পায়ের মাঝে বিস্তর ফাঁক রেখে দাঁড়ানো এরকম হাদীসগুলো শুনেছেন কখনো? তারা কাযা নামাযের ব্যাপারে ফাতাওয়া দেয়, ইসলামে কাযা নামায নেই। তাওবা করে নিলেই চলবে! এ জাতীয় হাদীস কখনো শুনেছেন? অথচ কাযা নামাযের কথা হাদীসের কিতাবে অসংখ্যবার উদ্ধৃত হয়েছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৭, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৩৪৯, ১৬৯৭৫) হাদীসের কিতাবগুলোতে কাযা নামাযের পদ্ধতিও বাতলে দেয়া হয়েছে। তারা আরোও বলে, আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে দিয়ে পাঁচটি কবীরা গুনাহ করিয়েছেন! সাহাবারা নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর গোমরাহ হয়ে গিয়েছিলেন! ইত্যাদি। কোথাও শুনেছেন এরকম হাদীস? মুসলিম শরীফের হাদীসে যাদের কথা বলে মুসলমানদের সতর্ক করা হয়েছে, দেখা গেলো এরাই তারা। হাদীসে তাদের ব্যাপারেই সতর্ক করা হয়েছে যে, 'তাদের থেকে দূরে থাকো যাতে তারা তোমাদেরকে গোমরাহ করতে না পারে।'

এখন নিশ্চয়ই সকলে বুঝতে পারছেন, এ গোষ্ঠীর নাম আহলুল হাদীস। আর আমাদের নাম হচ্ছে, আহলুস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ। আপনারা বিচার করুন-তো কোন নামটা সঠিক? আহলে হাদীস না আহলে সুন্নাহ? বিচার করার আগে হাদীস ও সুন্নাহর পার্থক্য বুঝতে হবে। এক সময়ে এ পার্থক্য জানার প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু বর্তমানে ঈমান হিফাজতের জন্য এ পার্থক্য জানা জরুরী হয়ে পড়েছে। হাদীস কী? নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ২৩ বছরের যাবতীয় কথা, কাজ, সরব বা মৌন সমর্থন, তার চারিত্রিক গুণাবলী ও দৈহিক অবকাঠামো ইত্যাদি সম্পর্কিত সকল বর্ণনাই হাদীস। হাদীস হচ্ছে এক ভান্ডার। আর এ ভান্ডারের একটা বিশেষ অংশ হচ্ছে সুন্নাহ। সুন্নাহ হচ্ছে, যা উম্মাহর জন্য অনুসরণযোগ্য। হাদীসের ঐ অংশ সুন্নাহ, যার মধ্যে উম্মাহর করণীয় ও অনুসরণীয় বিষয় রয়েছে। আর যেসব হাদীসে করণীয় কিছু উল্লেখ নেই, যেমনঃ দাজ্জালের আগমন, দাব্বাতুল আরদ ইত্যাদির ভবিষ্যদ্বাণীর মাঝে করণীয় নেই। (সূরা নামল : ৮২, বুখারী; হা.নং ৭১২৪) তাই এগুলো হাদীস বটে, কিন্তু সুন্নাহ না। আবার, হাদীসে করণীয় কোনো বিধান উল্লেখ থাকলে তখন দেখতে হবে সেটা

এখনো বলবৎ আছে, নাকি মানসুখ তথা রহিত করা হয়েছে? যেমন, বুখারী শরীফে ছয় জায়গায় এসেছে; ইমাম সাহেব বসে নামায পড়লে তোমরাও বসে ইক্তিদা করো। এ হাদীসের হুকুম আমাদের জন্যে বাকী নেই, রহিত হয়ে গেছে। দলীল হলো, ইন্তেকালের আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকদিন মসজিদে যেতে পারেননি। বুধবার রাত থেকে সোমবার পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শনিবার যুহরের নামাযে রাসুল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'জন সাহাবীর কাঁধে ভর করে মসজিদে গমন করেন। তারপর তিনি বসে যুহরের নামায পড়ালেন। আর পিছনে সাহাবীগণ সবাই দাঁড়িয়ে ইক্তিদা করলেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৮৭, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৪১৮)

সুতরাং বোঝা গেলো, বসে ইক্তিদা করা সংক্রান্ত বুখারী শরীফের আগের হাদীস রহিত হয়ে গেছে। এখন সেটা হাদীস হিসেবে রয়ে গেছে বটে, কিন্তু অনুসরণ করা যাবে না। তাই এটা সুন্নাহ না। যদি বসে পড়ার হাদীস রহিত না হতো, তাহলে সাহাবাগণ বসে না পড়ে, দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলেন কেনো? এজন্যে বসে ইক্তিদা করার হাদীসটি কেবলই হাদীস, সুন্নাহ নয়। অর্থাৎ অনুসরণযোগ্য নয়। অতএব বোঝা গেলো, হাদীসের বিশাল ভান্ডার থেকে যে অংশটুকু আমাদের জন্যে আমলযোগ্য বা পালনীয় এবং তা নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিলো শুধু সে অংশটুকু সুন্নাহ। আশাকরি এ আলোচনা দ্বারা হাদীস ও সুন্নাহর পার্থক্য পরিষ্কার হয়েছে। আমরা বলি, আমাদের জামা'আতের নাম হচ্ছে 'আহলুস সুন্নাহ।' 'আহলে হাদীস' না। কারণ আমরা সুন্নাহ অনুসরণ করি। আহলে হাদীস যারা দাবী করে তাদের জিজ্ঞেস করবেন, আপনারা যদি হাদীসের অনুসারী হয়ে থাকেন তাহলে ১১টা বিয়ে করুন। কারণ হাদীসে আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১১ জন নারীকে বিয়ে করেছিলেন। এমনকি, ৯ জন স্ত্রীকে রেখে ইন্তেকাল করার হাদীস বুখারীতেই আছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৬৮) বলুন তো, ১১ জন নারীকে বিয়ে করার অনুমতি আছে আমাদের জন্যে? না! অনুমতি নেই। ১১ জনকে বিয়ের কথা হাদীস, কিন্তু সুন্নাহ নয়। উম্মাহর অনুসরণযোগ্য নয়। সুতরাং 'আহলে হাদীস' নামটাই ভুল। হাদীসের অনুসারী দাবী করলে-তো সেসব হাদীসও অনুসরণ করা জরুরী যেগুলো আমাদের জন্যে নয়, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাস, অথবা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং বুখারী শরীফে উল্লেখ থাকলেই সেটা অনুসরণযোগ্য হয়ে যায় না। বুখারীতে এমন অনেক হাদীস রয়েছে যেগুলো রহিত হয়ে গেছে, অথবা যেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাস। সেগুলো সুন্নাহ নয়, বরং হাদীস। একটু আগে বলেছিলাম, স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পর যদি বীর্যপাত না হয়, তাহলে গোসল ফরয হয় না। এ হাদীস বুখারীতে দু'জায়গায় আছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৭৯,২৯৩) অথচ এটা মানা জায়েয নয়। কেননা এটা হাদীস; কিন্তু সুন্নাহ নয়।

সারকথা, আমরা ‘হাদীসের’ অনুসারী দাবী করি না। আমরা ‘সুন্নাহর’ অনুসারী দাবী করি। হাদীসের অনুসারী বা ‘আহলে হাদীস’ দাবী করাই গলদ। এখানে উলামাগণ উপস্থিত আছেন। আমার কথায় ভুল হয়ে থাকলে বলবেন। সুতরাং প্রথমে হাদীস বাছাই করতে হবে কোনগুলো উম্মতের জন্যে প্রযোজ্য। অতঃপর সেগুলো মানতে হবে। আর সে বাছ-বিচার করার দায়িত্ব হলো মুফতীদের ও উলামায়ে কিরামের। আপনারা নিজে নিজে বুখারীর বাংলা তরজমা পড়বেন না। কারণ বুখারীতে রহিত হাদীসগুলোর কথা আলাদা করে চিহ্নিত করা নেই। ফলে আপনি বুখারী শরীফ পড়ে মসজিদে এসে অনাকাঙ্ক্ষিক্ষত গোলমাল শুরু করবেন যে, আমি হাদীসে পড়ে এলাম এতোবার হাত তুলতে হয়, অথচ আমাদের হুযূররা একবারের বেশি হাত তুলছেন না। তারা কোন কিতাব পড়লো? আমি-তো বুখারী পড়েছি। আমি বলবো, আপনি-তো বুখারী পড়ছেন না, বরং বোকামী পড়ছেন অর্থাৎ অনুবাদ পড়ে এসেছেন। মূল বুখারীর এক লাইনও-তো পড়তে পারবেন না। কারণ, সেখানে যের-যবর দেয়া নেই। আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম, কোনো আহলে হাদীস যদি বুখারী শরীফের এক লাইন পড়ে শোনাতে পারেন, তাহলে আমি তাকে পুরস্কার দিবো। এক জায়গায় এ চ্যালেঞ্জ দেয়ার পর একজন আহলে হাদীস দাঁড়িয়ে বললো, আমি এক লাইন পড়ে দেই? আমি তাকে কাছে ডেকে বুখারী শরীফ সামনে খুলে দিয়ে পড়তে বললাম। সে পড়া শুরু করলো এই বলে, ছানা... ছানা...। আমি বললাম, বুখারী শরীফে ছানা-জিলাপি পেলেন কোথায়? এটা কি মিষ্টির কিতাব যে ছানা-জিলাপি সব পাওয়া যাবে এখানে? সে বললো, এই যে দেখেন হুযূর, ছা নূন আলীফ লেখা আছে, তাহলে কী হবে? আমি বললাম, আরে এটা তো ‘হাদ্দাছানা’কে সংক্ষেপে লেখা হয়েছে!! এই হলো তাদের হাদীস পড়ার অবস্থা। এবার আপনারা বলুন, তাদের ‘আহলে হাদীস’ নাম দেয়াটা সহীহ আছে কিনা?

আমরা যে ইজমা-ক্বিয়াস মানি তার দলীল হলো,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থঃ আমি আজকের দিনে তোমাদের জন্য ইসলামকে, আমার দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম...। (সূরা মায়িদা; আয়াত ৩)

এ আয়াতের তাফসীর করেছেন আল্লাহ তা‘আলা আরেক আয়াত দ্বারা। আয়াতটি হলো,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

এ আয়াত হলো আগের আয়াতের তাফসীর। আল্লাহ যে বলেছেন, আমি দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। প্রশ্ন হলো, পরিপূর্ণ কীভাবে হলো? পরিপূর্ণ এভাবে হলো

যে, এমন কোনো হুকুম-আহকাম ও মাসআলা থাকবে না যার কোনো সমাধান নেই। আর সেটা এভাবে যে, أَطِيعُوا اللَّهَ এটা হলো কুরআন, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ এটা হলো সুন্নাহ, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ এটা হলো ইজমা। অর্থাৎ ইমামগণ একমত হয়ে যে সিদ্ধান্ত দেবেন সেটা ইজমা। আর فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ এটা হলো ক্বিয়াস। উল্লিখিত আয়াতের এ তাফসীর আমি কমপক্ষে দশটি তাফসীরের কিতাবে পেয়েছি। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শরী'আতের দলীল চারটি। এ চারটি দলীল দ্বারা ইসলাম পরিপূর্ণ হয়েছে। সুতরাং যারা এ চারটির দুটোই মানে না, তারা সমাধান করবে কীভাবে? এ কারণে আমি এখানকার দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছে একটি কাগজ দিয়েছিলাম বিতরণ করার জন্য, যেখানে আমি আহলে হাদীস বন্ধুদের কাছে দশটি প্রশ্ন করেছি। তারা যদি নিজেদের দাবিতে সঠিক হয়ে থাকে তাহলে যেনো তারা এ দশটি প্রশ্নের উত্তর দেয়। আমি এ চ্যালেঞ্জ করেছি কমপক্ষে ছয় মাস হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো জবাব পাইনি। কিছুদিন পূর্বে হজ্জে গিয়েছিলাম। সেখানে মদীনা ভার্সিটির ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আমি বয়ান করেছিলাম। তাদেরকে বলেছিলাম, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ আহলে হাদীস থাকে তাহলে সে এ দশটি প্রশ্নের উত্তর দিক। চার মাযহাবের যে কেউ জবাব দিতে পারবে। কারণ তারা ইজমা-ক্বিয়াস মানে। আহলে হাদীসরা পারবে না, কারণ ওরা ইজমা-ক্বিয়াস মানে না।

আমার জানতে চাওয়া দশটি প্রশ্নের মধ্য থেকে একটি প্রশ্ন হলো, বিমানে নামায পড়া যাবে কিনা? নিশ্চয়ই এর একটি সমাধান প্রয়োজন। আপনারা তাদেরকে কুরআন-সুন্নাহ থেকে সরাসরি এর সমাধান দিতে বলুন। যেহেতু তারা শুধু কুরআন ও হাদীস মানে, আর কুরআন-হাদীসের কোথাও বিমানে নামায পড়ার কথা উল্লেখ নেই, তাই তারা এর কোনো সমাধান দিতে পারবে না। এমন দশটি প্রশ্ন আমি তাদের উদ্দেশ্যে করেছি। তারা আজ পর্যন্ত সেগুলোর একটিরও উত্তর দিতে পারেনি। ইনশা-আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত পারবে না! কারণ তারা গোমরাহ!!

মাযহাব মানা ছাড়া হাদীস মানা যায় না

আমি একটা বিষয় বলে আলোচনা শেষ করছি। দয়াকরে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেন। মাযহাব মানা এমন একটা বিষয় যে, মাযহাব মানা ছাড়া হাদীস মানা যায় না। এর একটা নমুনা দেখুন-

নামাযে দাঁড়াবেন কীভাবে? এক রিওয়ায়াতে পাওয়া যায়, পা মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭২৫) এখানে নিজের এক পা আরেক পায়ের সাথে মিলাবে? নাকি আরেকজনের পায়ের সাথে নিজের পা মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে? এর উল্লেখ নেই। আরেক রিওয়ায়াতে আছে যে, তোমাদের দু'জনের পায়ের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে, সেখানে জুতা রেখো না। (আবূ দাউদ; হা.নং ৬৫৪) এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, দু'জনের পায়ের মাঝে একটু খালি জায়গা থাকবে

যেখানে জুতা রাখা নিষেধ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এক রিওয়াযাতে আছে, মিলিয়ে দাও। আরেক রিওয়াযাতে আছে, খালি জায়গা থাকবে। তাহলে আমল করবেন কীভাবে? তারা কী করছে? মিলিয়ে রাখার হাদীসটি গ্রহণ করে ফাঁক রাখার হাদীসটি ছেড়ে দিয়েছে, অস্বীকার করে বসেছে। কোনো হাদীস তাদের মতের সাথে না মিললে তারা বলে ‘যঈফ হাদীস’। যঈফ কাকে বলে, তারা কি সেটা জানে? না। যঈফ কার গুণাগুণ? বর্ণনাকারীর না হাদীসের? কোনো বর্ণনাকারী দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলো, এ কারণে তার হাদীসগুলো যঈফ হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবে হাদীসটি-তো রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের। যঈফ বলা হয় বর্ণনাকারীর দিকে লক্ষ্য করে।

যা-হোক, হাদীস-তো দুই ধরনের। ওরা একটা ধরলো, একটা বাদ করে দিলো। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস। এ ব্যাপারে আমাদের ইমাম সাহেব ফায়সালা করেছেন-উভয়ের পা কাছাকাছি রাখো অর্থাৎ তোমরা দু’জনের দু’পা কাছাকাছি রাখো। একদম মিলিয়ে দিও না। আবার একদম ফাঁকাও রেখো না। এভাবে উভয় হাদীসের উপর আমল হবে। সুতরাং আমরা একটাও বাদ দিলাম না।

এবার আসুন, নামাযে হাত বাঁধবেন কোথায়? এক হাদীসে আছে নাভীর নিচে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৩৯৫৯) এটা বেশি মজবুত। আরেক হাদীসে নাভীর উপর। এটা যঈফ। (সহীহ ইবনে খুযাইমা; হা.নং ৪৭৯) এ হাদীসের একজন রাবী আছে, ‘মুআম্মাল ইবনে ইসমাঈল’। তিনি একটু দুর্বল। দুর্বল হোক, হাদীস কয়টা আছে? দুইটা। নাভীর নিচে ও উপরে। কোনটার উপর আমল করবেন? ওরা বলছে, আমরা নাভীর উপরেরটার উপর আমল করবো। তাহলে নাভীর নিচেরটার কি হবে? সেটা বাদ। আমরা একটাও বাদ দিবো না। আমাদের ইমাম সাহেব কোনোটাই বাদ দিলেন না। তিনি ফায়সালা দিলেন, তোমরা পুরুষরা নাভীর নিচে হাত বাঁধো, মহিলারা বুকের উপর হাত রাখো। উভয় হাদীসই সঠিক। একটা হাদীস পুরুষদের জন্য, আরেকটা হাদীস মহিলাদের জন্য। ওরা কোনটা নিলো? মহিলাদেরটা। আর পুরুষদেরটা বাদ করে দিলো! দেখুন কান্ড!

তারপর আছে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়বেন কিনা? এক হাদীসে আছে ফাতিহা ছাড়া নামায হবে না। ‘মুআত্তা মালিক’-সহ প্রায় পাঁচ/সাতটি কিতাবে আরেকটি হাদীস আছে, مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ

অর্থঃ তোমাদের যার ইমাম থাকবে তার কিরাআত পড়া লাগবে না। কারণ তার ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৮৫০, মুআত্তা মালিক; হা.নং ১২৪)

হাদীস কয় রকম? দুই রকম। এবার আপনি কী করবেন? ইমাম থাকলে ক্বিরা’আত পড়া যাবে না। আর ওরা বলে, ইমাম থাকলেও ক্বিরা’আত পড়া ছাড়া

নামায হবে না। ওরা ফাতিহা পড়ার হাদীসটি নিয়েছে, আর অন্যটাকে একদম বাতিল করে দিয়েছে। প্রশ্ন হলো, বাদ দিলো কেনো? আমরা যারা মাযহাব মানি, আমরা-তো একটাও বাদ দেই নাই। কেননা আমাদের ইমাম সাহেব ফয়সালা করে দিয়ে গেছেন। কী ফয়সালা করেছেন? 'ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না'-এ হাদীসটি ইমামের জন্য, আর একা নামায পড়নেওয়ালার জন্য প্রযোজ্য। আর দ্বিতীয় হাদীসটি ইমামের পিছে নামায আদায়কারী মুক্তাদির জন্য প্রযোজ্য। এভাবে আমরা উভয় হাদীসের উপর আমল করলাম। যখন আমরা ইমামের পিছনে থাকি তখন কোনটার উপর আমল করি? মুক্তাদির জন্য কিরাআত নেই। আর যখন একা হই তখন কিরাআত পড়ি। 'ফাতিহা ছাড়া নামায হবে না'-এ হাদীসটা কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? ইমাম এবং একা নামায পড়নেওয়ালার ক্ষেত্রে, ইমামের পিছে মুক্তাদীর ক্ষেত্রে নয়। ইমামের পিছে মুক্তাদীর ক্ষেত্রে ধরলে কী অসুবিধা হবে জানেন? অনেক সময় আপনি মসজিদে আসবেন, যখন ইমাম সাহেব রুকূতে চলে গেছেন। ফাতিহা কখন পড়বেন? বলেন-তো কখন পড়বেন? যদি বলেন রুকূতে গিয়ে পড়বো-তাহলে প্রশ্ন হবে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রুকূতে ও সিজদায় তোমরা কুরআন পড়বে না।

وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْسَاجِدًا

অর্থঃ রুকূতে গিয়ে কুরআন পড়বে না। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৪৭৯)

তাহলে কী করবেন? ওরা বলে, তাহলে আমরা দাঁড়িয়ে থাকবো; আমি শরীক হবো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ইমামকে যে অবস্থায় পাও ঐ অবস্থায় শরীক হয়ে যাও। এখন তোমরা কি করবে? তারা বলে, ঠিক আছে শরীক হয়ে যাবো। কিন্তু যেহেতু আমি ফাতিহা পড়তে পারি নাই, তাই এটাকে রাকা'আত ধরবো না। আমরা বলি, না; তা হবে না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, তুমি যদি রুকূ পাও তাহলে রাকা'আত পেয়েছো। রুকূ ধরবে, রাকা'আত ধরবে না? এর কী অর্থ? এটা-তো হাদীসের বরখেলাফ। আমাদের ইমাম সাহেব দু'টার ব্যাপারেই ফায়সালা দিয়েছেন। আমরা একটাও বাদ দিচ্ছি না। আর ওরা একটার উপর আমল করছে, আরেকটা বাদ দিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ ওরা 'হাদীস অস্বীকারকারী'!

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করুন! তারা বলে, আমরা বুখারী মানি। কিন্তু আসলে ওরা বুখারী মানে না। তাহলে স্ত্রীর সাতে মিলন করে বীর্যপাত না হলে ওরা কি উযূ করে? ওরা কি জিলহজ্জের ১১ ও ১২ তারিখে রোযা রাখে? ওরা কি একসাথে তিন তালাকে তিন তালাক মেনে নেয়? এই যে তিন তালাকে তিন তালাক মেনে নিলো না। এতে সন্তান কী হবে? হারামযাদা হয়ে যাবে। ওরা এরকম কান্ড করে, যার কারণে ওদের ছেলে-সন্তান চরম বেয়াদব হয়!

তারা বলে ‘যতক্ষণ পায়ূপথে বায়ূ বের হয়ে আওয়াজ না হবে ততোক্ষণ উযূ ভাঙ্গে না’। যা সম্পূর্ণ ভুল ও হাদীসের বরখেলাফ। তাই তাদের পিছনে ইকতিদা করা যাবে না। কারণ তারা বে-উযূ নামায পড়ায়। অথচ বায়ূ বের হওয়ার জন্য হাদীসে কোনো শর্ত নেই। বায়ূ বের হলেই উযূ ভেঙ্গে যাবে। এ অবস্থায় নামায পড়লে নামায হবে না। তাহলে তাদের কি নামায হয়? ওদের পিছনে কি ইকতিদা করা যাবে? উযূ না থাকায় ওদের নামায হয় না। ওদের পিছে ইক্তিদা করা যাবে না। ওদের নিকট সুন্নীদের মেয়ে বিয়ে দেয়া যাবে না এবং কোনো সুন্নী মুসলমানের জন্য ওদের মেয়ে বিয়ে করা ঠিক হবে না। এতে দ্বীন-ধর্ম সব নষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা‘আলা সকলকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়েম থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বি.দ্র. আহলে হাদীস বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. রচিত তিনটি কিতাব পড়ুন।

যথা-
(ক) হাদীসে রাসূল
(খ) তুহফাতুল হাদীস
(গ) মাযহাব ও তাকলীদ

সমাপ্ত